সোনার কাঠি

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি : শ্রুভাবতী চক্রবর্তী

স্ক্যান ও এডিট : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

ফোন : ৩৪-৭৭৪৮

সোনার কাঠির নিয়মাবলী

(১) সোনার কাঠির প্রতি সংখ্যা ষাট পয়সা। গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম দিতে হয়। চাঁদা (সডাক) : বার্ষিক ৬-টাকা, ষান্মাসিক ৩-টাকা। চাঁদার টাকা **এস রায়, ৩০, মদন চ্যাটার্জি লেন, সি-আই-টি বিল্ডিংস, এ-১৫, কলিকাতা—৭**—এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। সোনার কাঠি সম্পর্কে যাবতীয় চিঠিপত্রও ওই ঠিকানায় লিখতে হবে।

(২) সোনার কাঠির বর্ষ আশ্বিন মাস থেকে আরম্ভ হয়। যে কোন সময় টাকা পাঠিয়ে চল্‌তি বা পরবর্তী যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। এক বছরের গ্রাহক হলে ১ম সংখ্যা (শারদীয় সংখ্যা ১৩৭৪ মূল্য ২.৫০ পঃ) বিনামূল্যে দেওয়া হবে। যে সংখ্যা থেকে গ্রাহক হতে চান, মনি অর্ডার কুপনে বা পত্রে তার উল্লেখ থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

(৩) প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই পত্রিকা প্রকাশের তারিখ এবং ১৬ তারিখের মধ্যেই সমস্ত গ্রাহক গ্রাহিকার পত্রিকা ডাকে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। কোন কারণে ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পেলে, চিঠি লিখলে পুনরায় পত্রিকা পাঠানো হয়।

(৪) গ্রাহকের প্রত্যেক চিঠিপত্রে নাম, সম্পূর্ণ ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর অবশ্য উল্লেখ করবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করতে হলে বাংলা মাসের ৫ তারিখের মধ্যে জানাতে হবে।

(৫) লেখক-লেখিকা এবং গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা, তাঁদের আঁকা ছবি ও তোলা ফটো সম্পাদকের মনোনীত হলে প্রকাশ করা হয়; তবে কোন্ লেখা বা ছবি কোন্ সংখ্যায় প্রকাশ করা যাবে তা আগে থেকে একেবারেই বলা সম্ভব নয়। লেখা বা ছবির সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকেট না পাঠালে ফল্যাফল জানানো বা অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। যে-কোন লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখে পাঠাতে হবে।

কর্মাধ্যক্ষ, সোনার কাঠি, ৩০, মদন চ্যাটার্জি লেন, সি-আই-টি বিল্ডিংস, ১৫, কলিকাতা-৭ ও লক্ষ্মী প্রিন্টিং প্রেস, ৩৩/৪, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট-৬

সূচীপত্র

রিমঝিম বৃষ্টি (কবিতা)	কল্যানশঙ্কর সেনগুপ্ত	৫০৩
জয়সূর্য (ধারাবাহিক উপন্যাস)	রমেন দাস (সবুজ সাথী)	৫০৪
উলের বলটা !!! (কবিতা)	তমাল চট্টোপাধ্যায়	৫১১
ছড়া		
একটি ছড়া	অজয় গুপ্ত	৫১২
দুটি ছড়া	মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত	৫১২
স্যামুয়েল মর্স (প্রবন্ধ)	চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	৫১৩
অলিম্পিকের অমর কাহিনী	শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত	৫১৫
প্রফুল্লচন্দ্র (কবিতা)	নৃপেন আকুলি	৫২১
প্রতীক্ষা (কবিতা)	হরিদাস দাশগুপ্ত	৫২১
সুন্দরগড়ের রহস্য (গোয়েন্দা কাহিনী)	পার্থ চট্টোপাধ্যায়	৫২২
শ্রাবণে-প্লাবনে (কবিতা)	সরল দে	৫২৯
আজব ছড়া (কবিতা)	রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	৫২৯
ঠিক এগারোটায় (গল্প)	নির্মলেন্দু গৌতম	৫৩০
দেশের ডাকে (কবিতা)	আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫৩৫
সোনালী স্বপন (কিশোর উপন্যাস)	স্বপনবুড়ো	৫৩৬
ধূলোর রাজ্যে থাকে যারা (কবিতা)	বিশ্বপ্রিয়	৫৪২
ছবির কথা (চিত্রকলা)	অহিভূষণ মালিক	৫৪৩
গৌরাঙ্গ পর্বত ও বিধান পর্বত		৫৪৫
অঙ্কের ম্যাজিক (যাদুবিদ্যা)	যাদুশিল্পী সুনীল দত্ত	৫৪৬
টিঙ্কুর ভ্রমণ (কবিতা)	বিশন মিত্র	৫৪৭
খেলাধূলা	চিরঞ্জীব	৫৪৮

অনিল রায় কর্তৃক লক্ষ্মী প্রিন্টিং প্রেস, ৩৩/৪ রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত এবং সুকুমার রায় কর্তৃক সম্পাদিত।

বর্ষার জলের তলায় কলকাতার ভি, আই, পি রোড।

প্রথম বর্ষ ★ ১১শ সংখ্যা ★ শ্রাবণ ১৩৭৫

॥ রিমঝিম বৃষ্টি ॥

কল্যানশঙ্কর সেনগুপ্ত

রিমঝিম বর্ষা রিমঝিম বিষ্টি
ছিটছিটে কালো মেঘ কি ভীষণ মিষ্টি।
কোথা গেল সূর্যটা ঝলমলে রোদটা,
কোথা গেল হাসি হাসি মিষ্টি আলোকটা।
টুপটাপ ঝুপঝাপ বৃষ্টির ঝর্ণা
দুপুরের নীলাকাশ মিশকালো বর্ণা।

ভালোলাগে কালো মেঘ, ভেজা কাক দেখতে;
ভাললাগে আলসেমি, একা বসে থাকতে।
সবচেয়ে ভাললাগে সে কি যে বলব,
ঠাকুমার কাছে বসে রূপকথা গল্প॥

॥ বার ॥

হাসপাতালের প্রশস্ত করিডরে জুতোর আওয়াজ তুলে সামরিক কর্তা ব্যক্তিদের একটা মিছিল ৭নং কেবিনের সামনে এসে দাঁড়ালো।

কেবিনের মধ্যে বিছানায় শায়িত জয়সূর্য। তার মাথার কাছে বসেছিলেন সুজাতা দেবী। তিনি ধীরে ধীরে ছেলের মাথায় হাত বুলোচ্ছিলেন।

বাইরের পদশব্দে তিনি মুখ তুলে তাকালেন। পর্দার ওপাশে কতকগুলি লোকের ছায়া। সুজাতাদেবী মৃদুকণ্ঠে বললেন : ভেতরে আসুন।

আগন্তুক দলটি ভিতরে প্রবেশ করলো। সামনের মানুষটিকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক সুজাতাদেবী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, আপনি ?

[নেতাজীর নেতৃত্বে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'এর ভারত অভিযান। দিল্লীর লাল কেল্লায় ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জয়ধ্বনিতে সিঙ্গাপুরের আকাশ-বাতাস তখন মুখর। দলমত নির্বিশেষে সকল ভারতীয় নরনারী যোগ দিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীতে। কিন্তু কিশোররা ? তারাও পিছিয়ে থাকেনি সেদিন। নেতাজীর উপস্থিতিতে গঠন করা হ'লো "বালসেনা"। আর সেই সেনাদলের নেতৃত্ব পেল 'জয়সূর্য'—এক নির্ভীক কিশোর। ইতিহাস-উজ্জ্বল-করা সেই অজ্ঞাতপ্রায় কাহিনীকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাস—'জয়সূর্য'।]

আমার বীর জওয়ান ভাইটিকে দেখতে এলাম, আগন্তুক দলের পুরোবর্তী ভদ্রলোকটি স্মিতহাস্যে এগিয়ে এলেন, কেমন আছে ছেলেটি ?

এতক্ষণ চোখ বুজে মায়ের হাতের আদর খাচ্ছিল জয়সূর্য, এবার ঘরের মধ্যে নতুন মানুষের সাড়া পেয়ে চোখ খুললো।

কিন্তু একি? কাকে দেখছে জয়সূর্য তার চোখের সামনে? কোটি কোটি ভারতবাসী শুধুমাত্র যে বিপ্লবী সেনাপতির নাম উচ্চারণ করেই ধন্য হয়ে যায়, সেই নেতাজী স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন জয়সূর্যের শয্যার পাশে। এ আনন্দ, এ অহঙ্কার জয়সূর্য চুপ করে শুয়ে উপভোগ করবে? উত্তেজনায় উঠে বসলো জয়সূর্য, আপনি?

তেমনি স্মিতমুখে নেতাজী এগিয়ে এসে জয়সূর্যের কচি হাত তুলে নিলেন নিজের হাতে, বললেন বাহাদুর বাচ্চা, তোমার কৃতিত্বে সিঙ্গাপুর শহর সেদিন এক ভীষণ বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। সাতজন দুষমন ধরা পড়েছে আমাদের হাতে। না, একজনও পালাতে পারে নি। তোমাকে যে গুলি করেছিল তার সঙ্গে আরো ছজনের সামরিক আইনে কোর্টমার্শাল হয়ে গেছে। সাবাস, মেরা বাচ্চা!

আনন্দে জয়সূর্যের দুচোখ দিয়ে ধারা নেমেছে। নেতাজী তাঁকে ছুঁয়ে আছেন, মনে হচ্ছে যেন একটা অগ্নিকণার স্পর্শে উত্তপ্ত, উদ্দীপ্ত হচ্ছে তনুমন। নেতাজী হেসে কথা বলছেন, মনে হচ্ছে যেন এক পরমার্থীর ভালোবাসার কণ্ঠস্বর সুধা ঢেলে দিচ্ছে তার কানে।

আমাকে আপনি আপনার দলে নিয়ে নিন, নেতাজী, অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো জয়সূর্য।

আমার দলে? হাসলেন নেতাজী, তারপর বললেন আমার তো কোনো দল নেই ভাই। দল তো দেশের, দেশের মায়ের, তোমার, তোমার মত যারা দেশকে ভালোবাসে তাদের।

আমরাও লড়াই করবো, নেতাজীর মুখের দিকে চেয়ে এতদিন বাদে কিশোর জয়সূর্য নিজের মনের কথাটা বলে ফেলে এক নিঃশ্বাসে।

লড়াই? কিশোর জয়সূর্যের মাথার কাছে বসা জননী সুজাতা দেবীর মুখের দিকে চেয়ে বোধ হয় এই দাবীর সমর্থন খুঁজলেন নেতাজী। মনে পড়লো নিজের জীবনের সংগ্রামমুখর প্রহরগুলির কথা। বারবার, কতবার রাজরোষে বৃটিশ রাজের কারাগারে স্থানান্তরিত হতে হয়েছে, আলিপুর, প্রেসিডেন্সী, সুদূর মান্দালয় জেলে দিন কাটাতে হয়েছে—সেই কারাবাসের ক্লান্ত প্রহরে এমনি ভাবেই এলগিন রোডের একটি বাড়ীতে আর এক জননী এমনি উদ্বেগ আর আশঙ্কা, মমতা আর ব্যাকুলতা নিয়ে দিন কাটিয়েছেন। দেশজননী আর গর্ভধারিনী জননীর মধ্যে সেদিন কোন

পার্থক্য তার ছিল না বলেই এক জননীর আশীর্বাদ নিয়ে আরেক জননীর বন্ধন-মোচনের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছিলেন।

সত্যিই সুজাতা দেবী স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন ছেলের মুখের দিকে। আবেগে তাঁর বুকটা দুলে উঠছিল, ভরে উঠছিল। সেই সন্ধ্যায় জয়সূর্য অমন করে বের হয়ে যাবার পর যে আতঙ্ক জেগেছিল যে উদ্বেগ দেখা গিয়েছিল আজ তার চিহ্নমাত্র নেই তাঁর মুখে। যেন বুঝতে পেরেছেন এ ছেলেকে বেঁধে রাখেতে পারবেন না তিনি। স্বামীর সঙ্গে নিভৃত সাধনায় যে মন্ত্র ছেলের কানে এতদিন তুলে দিয়েছেন আজ পৃথিবীব্যাপী ঝড়ের মাতনে সেই মন্ত্র তার দাবী নিয়ে এসে ডাক দিয়েছে।

যেতেই হবে। সে রাতে অমন পাগলের মত অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে যে ছেলে বেরিয়ে পড়েছিল সেই ছেলে যেন আর তার জয়সূর্য নয়।

বলুন নেতাজী আপনি আমাকে, নেবেন? কিশোর কণ্ঠে যেন যুগযুগান্তরের প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠলো।

স্থির দৃষ্টিতে উন্মুখ কিশোরের উজ্জ্বল দুটি চোখের দিকে তাকালেন নেতাজী, তারপর পর্শ্বচর এক অফিসারকে ইংগিত করলেন। অফিসারটি এগিয়ে এসে একটি সামরিক আদেশ নামা নেতাজীর হাতে তুলে দিলেন।

নেতাজী কাগজটা খুলে একবার চোখ বুলালেন ওর উপর তারপর সেটি বাড়িয়ে দিলেন সুজাতাদেবীর দিকে।

সশ্রদ্ধ ভঙ্গীতে নেতাজীর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে সুজাতা দেবী ভাজ খুলতে যাচ্ছিলেন, নেতাজী বললেন, এখন নয়, ছেলে ভালো হয়ে উঠুক, তারপর যদি ভালো মনে করেন তাহলে ওকে পড়িয়ে শোনাবেন!

আর একবার মৃদুহাতে জয়সূর্য্যের পিঠে একটা চাপড় মেরে নেতাজী দরজার দিকে এগোলেন।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জয়সূর্য বলে উঠলো—জয়হিন্দ!

ঘুরে দাঁড়ালেন নেতাজী তারপর মিষ্টি হেসে 'জয়হিন্দ' বলে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেলেন সদলে।

কাগজটায় কী রয়েছে মামণি? প্রশ্ন করলো জয়সূর্য।

ধীরে চিঠিটার ভাজ খুললেন সুজাতা দেবী। সামরিক আদেশনামার অক্ষর

গুলো তার চোখের সামনে যেন আগুন হয়ে জ্বলে উঠলো।

হুকুমৎ ই আজাদ হিন্দের ফর্মান। স্বয়ং নেতাজীর নামাঙ্কিত হুকুম নামা আজাদ হিন্দ ফৌজের তাঁবে নতুন সেনাবাহিনী গঠিত হচ্ছে। কর্ণেল লক্ষ্মী স্বামীনাথন যেমন গড়েছেন ঝান্সী বাহিনী তেমনি কিশোর ছেলে মেয়েদের নিয়ে গড়া হচ্ছে বাল সেনা। আর সবচেয়ে অবাক কাণ্ড সেই বাল সেনা দলের নতুন ইউনিটের গ্রুপ ক্যাপ্টেন মনোনীত হয়েছে ক্যাপ্টেন জয়সূর্য!

বারবার করে চোখের জল ঝরে পড়লো সুজাতা দেবীর। ছেলের হাতে তুলে দিলেন তিনি নেতাজীর স্বাক্ষরিত কাগজখানি। অসুস্থ জয়সূর্য তা পড়ে গর্ব্বে ও আনন্দে অধীর হয়ে উঠে বসলো বিছানার উপর, তার চোখেও জল। তবে সে জল আনন্দের আবেগ মেশানো। সেও বুঝতে পারলো তার মায়ের চোখেও আনন্দাশ্রু। অসুস্থ জয়সূর্য এবার সুজাতা দেবীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। বললো: মা আমায় আর তুমি বাধা দিও না। কোনও দিনও না। নেতাজীর আহ্বানে নতুন করে যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো কিশোর জয়সূর্য। আর সুজাতা দেবী? তিনিও ছেলের গর্বে গর্ব্বিত হয়ে উঠলেন। বললেন: হারে জয়—দেশজননীর সেবা করাইতো আমার সেবা করা!

প্রায় ছমাস পরের কথা।

॥ ১৩ ॥

রেঙ্গুন থেকে চট্টগ্রামের সীমান্ত পর্যন্ত ঘন অরণ্যে ঢাকা দুর্গম পথে বোমার ভয়ে ভীত একদল পলাতক উদ্বাস্তুর ভীড়ের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে একটি সুদর্শন কিশোর। ইংরেজ বর্মা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওদের সেনাবাহিনীর এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঘাটিগুলোর পাশ দিয়েই উদ্বাস্তুদের যাতায়াতের পথ।

কিশোর ছেলেটির যেন পথ চলার তাড়া নেই। সঙ্গীরা কয়েকবারই প্রশ্ন করেছে, তুমি কোথায় যাবে? সঙ্গে কে আছে? উত্তর দেয়নি ছেলেটি। মুখ বুজেই পথ চলছে, কখনো বা পথের পাশে বসে পড়ছে।

দেখে দেখে কেউ প্রশ্ন করে না আর। নিশ্চয়ই বাপমা আত্মীয় স্বজন সব বোমায় মরেছে। কী হবে অতশত খোঁজ নিয়ে? নিজেদের প্রাণ নিয়েই টানাটানি দরদ দেখাতে গেলে যদি এই উট্‌কো আপদ ঘাড়ে এসে জোটে। তার চেয়ে মরুকগে।

যদি কপালে থাকে তাহলে হাঁটাপথে হয়তো একদিন ভারতে পৌঁছাতে পারবেই।

কিন্তু ছেলেটার যেন ভারতে পৌঁছোবারই কোনো গরজ নেই। সঙ্গীরা সবাই এগিয়ে যাচ্ছে ও চলেছে থেমে থেমে। এখানে বসছে খানিক ওখানে দাঁড়াচ্ছে কিছুক্ষণ। পথের ধারে ঝরণা বা বুনো ঝোপের পাশে পা ছড়িয়ে বসে হাতের গুলতি দিয়ে পাখীর দিকে তাক করছে। হয়তো পাখী শিকারে মত্ত!

রেঙ্গুন থেকে মাইল ত্রিশেক পশ্চিমে ইংরেজদের জবরদস্ত একটা ঘাঁটি। জংগলের মধ্যে বেস ক্যাম্প। বিমান ঘায়েল করার সারি সারি কামান, হাতে গুনে শেষ করা যায় না এতগুলো ফৌজী মোটর গাড়ী, কত লোকজন, এ এক এলাহি ব্যাপার আর কী!

এই ঘাঁটি থেকে এগিয়ে আসা জাপানী আর আই এন, এ ফৌজকে বাধা দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ব্রিটিশ বাহিনী। ছেলেটা সেখানে আটকে গেল।

ঘুরছে ক্যাম্পের আশে পাশে। সায়েব এক টুকরো রুটি দেবে? কদিন কিছু পেটে পড়েনি।

সুন্দর চেহারার ছেলে। দেখে বোধ হয় একটা গোরা সেপাইর মায়া হয়। ইসাড়া করে ডাকে, শোন্ এদিকে আয়।

ছেলেটি এগিয়ে যায়। আর একটু পরেই ক্যাম্পের লড়াই পাগল সায়েবগুলো ওকে আপনার করে নেয়। আহা, বাপ মা বোমা খেয়ে মরেছে, একা একা চলেছে। রিফিউজি হয়ে ভারতে। তা এভাবে নিঃসম্বল হয়ে কোথায় যাবে। থাকোনা আমাদের ক্যাম্পে। সেপাইদের ফুটফরমাশ খাটবে। খাওয়া দাওয়ার অভাব হবে না। যুদ্ধের ডামাডোল থেমে গেলে জাপানী হলদে কুত্তাগুলোকে শেষ করে ফেলার পর আমরা তোমাকে ভারতে পৌঁছে দেবো।

ছেলেটি যেন এক কথায় রাজী। কোথায় ঘুরবে পথে পথে? তার চেয়ে এই বেশ। খাওয়া দাওয়ার ভাবনা নেই। থেকে যাই এখানে।

তা সেদিন বিকেল থেকেই সারা ক্যাম্প টহল দিচ্ছে ছেলেটি। মেজর সায়েবের জুতো পালিশ করেই দৌড়াচ্ছে এ্যান্টি কামানের দিকে। সরল, গোবেচারার মত গুণছে এক, দুই, তিন, চার করে কামানগুলো। কখনো বা গাড়ীগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে দেখছে। বলছে, ও বাবা তোমাদের এত গাড়ী!

সায়েবরা মজা পেয়েছে বেশ। কেউ দিচ্ছে রুটি কেউবা টিনে জমান দুধ, খাও খোকা পেট ভরে খাও। একবার জাপানীদের হটাই না তারপর আরো খাওয়াবো, যতখুশী।

তা ছেলেটির সে মাথা ব্যাথা নেই। শুধু কদিন বাদে রাতের বেলা মেজর সায়েবের তাঁবুর বাইরে গুটি গুটি চলে এসেছে সে। ক্যাম্পের কোথায় কোন জায়গায় নৈশ প্রহরীরা টহল দিচ্ছে সব ওর মুখস্ত। সন্তর্পনে প্রহরীদের এড়িয়ে ছেলেটি রান্নাঘরের পাশটিতে আবর্জনা ফেলবার স্তূপের দিকে এগিয়ে চলেছে। হাতে ঝুলছে তার সর্বক্ষণের সঙ্গী সেই গুলতিটি।

কিছুক্ষণ কান পেতে থাকে ছেলেটি। না কেউ জেগে নেই। শুধু টহলদারী পাহারার বুটের মসমস খটখট শব্দ। গুলতিটা হাতে ধরে ছেলেটি চারদিকে আর একবার তীক্ষ্ম নজর দিয়ে বলতে থাকে : হ্যাল্লো, বেস ইউনিট···বেস ইউনিট ৭৩২১, হ্যাল্লো বেস ইউনিট ৭৩২১.....

গুলতিটার মধ্য থেকেই যেন মৃদু একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, বেস ইউনিট ৭৩২১ বলছি ...পাইওনিয়ার বালসেনা নম্বর ২৯২।

ধীরে ধীরে ছেলেটি গুলতির ট্রান্সমিটারে রেঙ্গুনকে জানিয়ে দিচ্ছে এই ইংরেজ ক্যাম্পের বিস্তারিত গোপন সংবাদ। কটা এ্যাক, এ্যাক গান আছে, আর্মাড কারগুলোর সংখ্যা কটি, জায়গাটার লোকেশান কি। অতর্কিত হানা দিলে কোন সময়, কোথা থেকে হানা দিয়ে অতি সহজেই ঘাঁটিটা দখল করা যাবে। সব।....

কাজ শেষ করে ছেলেটা উঠে দাঁড়ালো; তারপর আবার ফিরে চললো মেজর সায়েবের তাঁবুতে। আর একটু পরেই মেজর সায়েব উঠবেন। তার আগেই ব্যাটার জুতোতে কালি ধরাতে হবে।

এমনিতে যতই ভালো বাসুক সায়েব জুতোতে মুখ দেখা না গেলে রেগে হয়তো লাথিই কষিয়ে দেবে। লাথি, দু চোখ জ্বলে উঠলো ছেলেটির।

দাঁড়াওনা। এই কদিনে যে কটা লাথি মেরেছো তার সবকটার শোধ কড়ায় গণ্ডায় যদি শোধ নিতে না পারি তাহলে আমার নাম জয়সূর্য নয়।—মনে মনে এধরনের অনেক কথাই ভাবে জয়সূর্য।

পরের দিন ভোরবেলায় ছেলেটা হারিয়ে গেল। দূরে জাপানীরা বোমা বর্ষণ

করছে। ক্যাম্পের আশে পাশেও পড়েছে দু একটা বোমা তবে এই সুরক্ষিত, দুর্ভেদ্য ঘাঁটির কোন ক্ষতি হয়নি। শুধু বাচ্চাটাকে পাওয়া যাচ্ছেনা যাকগে, মরুকগে গুলতি নিয়ে সারা দিন ঘুরছে জঙ্গলের কোথায় সাপে কেটেছে, না বাঘে খেয়েছে কে জানে।

সারাটা দিন মেজর সাহেব মন ভার করে বসে রইলো। মাত্র দু দিনেই বড্ড মায়া পড়ে গিয়েছিলো কচি ছেলেটার উপর। তাই সে চলে গেলেও মেজর সাহেব তাকে ভুলতে পারলো না। ঘুরে ফিরে বারংবার ছেলেটার সরল সহজ মুখখানা তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো।

সন্ধ্যে হয়ে এলো। নিজের তাঁবুতে বসে এক কাপ কফি নিয়ে মাত্র চুমুক দিয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গেই যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। অতর্কিতে আক্রমণ চালালেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। দুর্ভেদ্য এই ঘাঁটির উপর যেন মুহূর্তেই প্রবল শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীর দল। স্বদেশভূমি ভারতকে ইংরেজশাসন মুক্ত করার জন্য তাঁদের সে কী ভীষণ আকুলতা কী পবিত্র নিষ্ঠা!

কে জানে কী করে ওঁরা খবর পেলেন ঐ গোপন ঘাঁটির! যেন মেপে মেপে বোমাগুলো পড়ছে এ্যাক এ্যাক গানের উপর; বোমা ফাটছে কনভয়ের উপর। জ্বলছে মেজর সাহেবের তাঁবু, ইংরেজদের যুদ্ধের রসদপত্র আর অস্ত্রশস্ত্র।

চারিদিক থেকে আজাদী বাহিনী ঘিরে ফেলেছে ইংরেজদের ঐ ঘাঁটিটি। পঙ্গপালের মত মরছে। শতশত ইংরেজসৈন্য। না আর নয়; আর উপায় নেই। আত্মসমর্পণ করো—সাদা পতাকা দেখাও। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। জান গেলে কী ইজ্জত নিয়ে ধুয়ে খাবো? মেজর সাহেবের নেতৃত্বে এবার সব সৈন্যেরা আজাদ হিন্দ ফৌজের কাছে পরাজয় স্বীকার করলো। সকল ইংরেজ সৈন্যই এখন যুদ্ধ বন্দী। আজাদী বাহিনীর নির্দ্দেশে পায়ে হেঁটে তারা চললো রেঙ্গুনের পথে। যাওয়ার পথে সাহেব দেখলো—কী আশ্চর্য্য—ঘাঁটি ধ্বংস হবার কদিন আগে যে রিফিউজি কচি ছেলেটা তার জুতোয় কালি দিত, সেই ছেলেটাই আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যাজ এটে সামরিক পোষাক পরে গটগট করে হেঁটে একটা জীপ গাড়িতে গিয়ে উঠলো। না—ভুল হবার নয়—সেই কচি ছেলেটাই। ওর কোমরেও সেই গুলতিটাই ঝুলছে।....

আক্রোশে দু'চোখ জ্বলে উঠলো মেজর সাহেবের। শয়তান, বেইমান! মনে মনে চাপা ক্ষোভ প্রকাশ করলো সাহেব মেজর। তা' ছাড়া আর তার করারই

বা কী আছে। মেজর নিজেই যে এখন আজাদ হিন্দ বাহিনীর কাছে বন্দী। উঁচু মাথা নীচু করেই সে হেঁটে চলে অন্যান্য যুদ্ধ বন্দীদের সঙ্গে। একবার শুধু জয়-সূর্যের চোখে চোখ পড়লো। মেজর লজ্জা পেলো; কিন্তু কিছু আর বলতে সাহস পেলো না। দেখলো: সেই জুতো পালিশ করা কিশোর ছেলেটার চোখে মুখে তখন অন্য এক ভাব—কর্ত্তব্যপরায়ণ সৈনিকের গাম্ভীর্য্য ও নিষ্ঠা।

জয়সূর্য এবার আর দেরী করলো না। বোধ হয় অন্য কোন জরুরী কাজের জন্য সে আবার তৈরী হলো। আর অপেক্ষমান জীপে উঠেই ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়ার নির্দেশ দিলো। গাড়ি ধূলো উড়িয়ে ছুটে চললো। পেছনে পড়ে রইলো যুদ্ধবন্দীদের সেই সারি—যারা মাথা নীচু করে তখনও পথ হাঁটছিলো। হাঁটছিলো আর হয়তো ভাবছিল আজাদী বাহিনীর বীর বিক্রমের কথা!

[ক্রমশঃ]

———

উলের বলটা !!!

তমাল চট্টোপাধ্যায়

খুকু বসে বুনছে উল
পুষি ঝিমোয় পাশে,
হাত ফস্‌কে পড়ল হঠাৎ
উলের বলটা খসে।

গড়তে গড়তে বলটা ক্রমেই
যাচ্ছে চলে দূরে,
পুষিকে তাই বললে খুকু
'আনগে ওটা ধরে।'

কাজেই পুষি গোঁফ ফুলিয়ে
নিল বলের পিছু,
কিন্তু যে তার বুদ্ধি মাথায়
ঘাট্‌তি ছিল কিছু!

তাতেই পুষি পড়ল প্যাঁচে
আন্‌তে গিয়ে ধরে,
থাবার মাথায় বলটা লেগে
কেবলি যায় সরে।

বারান্দাটার শেষ প্রান্তে
থমকে হাঁপায় পুষি,
ভাবল এবার ধরবে ঠিকই
মনটা বেজায় খুশী!

পায়ের নীচে কুড়-টা চেপে
বলটা খুঁজেই সারা,
কাণ্ড দেখে খুকু তখন
হেসেই পাগল-পারা।

———

ছড়া

দুটি ছড়া

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

॥ এক ॥

ঝুমুর সোনা পুতুল খেলে
ছোট্ট মেয়ে মিষ্টি,
সোনা ঝিক্‌মিক্ রুপো ঝিক্‌মিক্
পড়ছে ঝরে বৃষ্টি !
জ্যোৎস্না চাঁদের
উজার করা বন্যা,
সাতনরী হার
গড়িয়ে দেবো কন্যা ॥

*

॥ দুই ॥

আমপাতা জামপাতা
কাঁঠাল পাতায় সই,
কাদায় জলে তৈরী হলো
বাসি বিয়ের দই।
এ-পার গঙ্গা ও-পার গঙ্গা
মধ্যি খানে চর।
ঝুম্‌কো লতা টোপর মাথায়
বসলো সেথায় বর
ইল্টি বিল্টি শিল্টিরা সব
বিয়ের বর যাত্রী,
দশটা তেরোয় লগ্ন গেল,
কোথায় তবু পাত্রী ?

———

একটি ছড়া

অজয় গুপ্ত

আইকম বাইকম হাওয়াই গাড়ি,
গাড়ি চললো গৌরীবাড়ি।
গৌরীবাড়ির মৌরী গাছে
পান-মুখে পানকৌড়ি নাচে।

পানে পুড়লো দাঁতের পাটি
দাঁত বাঁধাতে বদ্যিবাটী।
বদ্যিবাবুর সর্দি ভারি,
তাই গিয়েছে শ্বশুরবাড়ি।
শ্বশুর বাড়ির মাস্টার যদু
লুকিয়ে খেলো তিনপো মধু।
মধু ছপ্‌ছপ্ যদুর দাড়ি
মিছিল লালকালো পিঁপড়ের সারি।

আইকম বাইকম হাওয়াই গাড়ি—
মিছিল চললো যদুর বাড়ি ॥

———

স্মরণীয় মানুষ

স্যামুয়েল মর্স

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১৮৩২ সালের ১লা অক্টোবর। ফরাসী জাহাজ 'স্যালী' ফ্রান্সের লে হাভ্রে বন্দর থেকে নিউইয়র্কের দিকে চলেছে। যাত্রীদের মধ্যে আছেন একজন আমেরিকান শিল্পী। নাম স্যামুয়েল মর্স। ফ্রান্স আর ইতালী বেড়িয়ে তিনি বাড়ী ফিরছেন।

তখন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সম্পর্কে অনেকের বিশেষ কিছু জানত না। তাই জাহাজে এক তরুণ ডাক্তার যখন একটা ঘোড়ার নালের মত লোহার ওপর তার জড়িয়ে ব্যাটারীর বৈদ্যুতিক তরঙ্গ চালিয়ে চুম্বকের খেলা দেখিয়ে সবাইকে আনন্দ দিচ্ছেন, তখন মর্স আগ্রহের সঙ্গে ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন। ব্যাটারীর সঙ্গে তার সংযোগ হতেই লোহাটি পেরেক আকর্ষণ করছিল আর সংযোগ ছিন্ন হতেই পেরেকগুলো মেঝেয় পড়ে যাচ্ছিল।

মর্স ভাবতে সুরু করলেন এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় কি খবর পাঠানো যায় না? মর্সের মাথায় যখন থেকে এই চিন্তা ঢুকল তখন থেকে মর্স একলা নিজের কেবিনের মধ্যে বসে ভেবেই চললেন সারাটা পথ।

জাহাজ নিউইয়র্কে পৌছল। ক্যাপটেনের সঙ্গে মর্সের বন্দরে নামবার সময় দেখা হ'ল। ক্যাপটেন বললেন, 'সারা পথটা' একলা কাটালেন, খুব জরুরী কোন ব্যাপার নিশ্চয়? মর্স দেখালেন একটি খাতা তাতে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ড্রইং। মর্স বললেন, 'ক্যাপটেন যদি কোনদিন শোন ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ করে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে খবরের আদান প্রদান হচ্ছে তবে জেনো সেই টেলিগ্রাফ আবিষ্কার হয়েছে তোমার এই জাহাজের বুকেই।'

নিউইয়র্কে ফিরে নামকরা শিল্পী ছবি আঁকতে ভুলে গেলেন। মেতে রইলেন তাঁর ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ নিয়ে। উপকরণ মাত্র পুরোন একটা ঈজেল,

একটা ঘড়ির চাকা, একটুকরো পেন্সিল কাগজ, একটা ছোট ব্যাটারী আর একটা বৈদ্যুতিক চুম্বক।

মর্স কৃতকার্য হলেন কিন্তু খবরটা গেল মাত্র পঁয়তাল্লিশ ফুট, তাও দু'বছর ধরে চেষ্টা করার পর।

১৮৩৭ সালে ৪ঠা সেপ্টেম্বর অ্যালফ্রেড ভেল নামে একজন লোহার খনি মালিকের ছেলে মর্সের আবিষ্কারে উৎসাহিত হয়ে মর্সের সঙ্গে যোগ দিয়ে একটা বড় হলের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে খবর পাঠান। সেদিন সে হলে উৎসুক দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে এ কথাটি টেলিগ্রাফে পাঠান হ'ল—সফল পরীক্ষা টেলিগ্রাফে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮৩৭।

এরপর মর্স আর ভেল দুজনে সাঙ্কেতিক চিহ্ন উন্নতি করার জন্যে চেষ্টা করে যেতে লাগলেন।

একদিন মর্স বন্ধুকে বললেন দেখত' খবরের কাগজের লেখার মধ্যে কোন অক্ষরটি বেশী আছে। দেখা গেল ঈ অক্ষরটি সবচেয়ে বেশী দরকার। ঈর সাংকেতিক চিহ্ন দেওয়া হল ডট্। তারপরের প্রচলিত অক্ষর টি, তার চিহ্ন হল ড্যাশ। এই ভাবে এ থেকে জেড পর্যন্ত ডট ও ড্যাশের নতুন সাংকেতিক বর্ণমালা তৈরী করলেন মর্স। যা মর্স কোড নামে পরিচিত। এরপরে অবশ্য নব নব ধরণের সাংকেতিক বর্ণমালা তৈরী হয়েছে।

১৮৪৪ সাল। ওয়াশিংটন থেকে বালটিমোর চুয়াল্লিশ মাইলের ব্যবধানে খবর পাঠান হবে। সারা বিশ্বকে চমকে দিয়ে মর্সের এই টেলিগ্রাফের লাইন দিয়ে প্রথম টরেটক্কা চুয়াল্লিশ মাইলের ব্যবধান দূর করেছিল। প্রথম সেই টরেটক্কায় লেখা হল বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি, 'ঈশ্বরের সৃষ্টি কি মহিমাময়!'

মানুষ ঈশ্বরের সেই সৃষ্টির সৌন্দর্যকে আরও সুন্দর করে তোলার জন্যে অবিরত চেষ্টা করে চলেছে। স্যামুয়েল মর্সের যুগান্তকারী এই আবিষ্কার এই সুন্দরেরই সাধনা।

———

অলিম্পিকের অমর কাহিনী

১

শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত

আলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনার ইতিহাস আজও সঠিক ভাবে রচিত হয়নি। চারণদের গানে, মহাকবিদের মহাকাব্যে ও বলী মহাবলীদের বীরত্ব গাথায় সূচনার বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। সে যুগের মহাবলীদের বীরত্বব্যঞ্জক কর্যাকলাপের স্মৃতি হিসেবে কয়েকটি বিবরণ দেওয়া হল।

প্রথমটি দেবাদিদেব জিউসের স্বর্গভূমির অধিকার নিয়ে ক্রোনান ও টিটিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ ও বিজয় উৎসবের স্মৃতি পালন হিসাবে আলিম্পিয়ার প্রান্তরে যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় তাই অলিম্পিক ক্রীড়ার সূচনা বলে পরিচিত।

স্বর্গভূমির অধিকার নিয়ে দেব দানবদের যুদ্ধ, দেবাদিদেব মহাদেবের গজাসুর, কালাসুর নিধন, ত্রিপুর ধ্বংস ও দানবদের পরাজিত করে স্বর্গভূমির অধিকার রক্ষা আমাদের পুরাণেরও পরিচিত কাহিনী।

"অলিম্পিক কথাটিতেই যাদু! অলিম্পিকের প্রাঙ্গণ পৃথিবীর সব জাতির মিলনকেন্দ্র। অলিম্পিক সম্পর্কে তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহে লেখক দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর সেই নিরলস সাধনার ফল 'অলিম্পিকের ইতিকথা'। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির বুলেটিনে বইটির ভূয়সী প্রশংসা করে প্রামাণ্য ইতিহাসরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। লেখক ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে আবার সেই "অলিম্পিকের অমর কাহিনী" লিখছেন। ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশিত হচ্ছে।

হেরাক্লেশ অলিম্পিয়ার ষ্টেডিয়াম সব চেয়ে কম সময়ে অতিক্রম করতেন চারণদের হেরাক্লেশ বীরগাথার এ কাহিনী প্রমাণ করে হেরাক্লেশ যে সময়ে জীবিত ছিলেন সে সময়েও অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব ছিল।

দ্বিতীয় উপকথা হেরাক্লেশের* নিজের সম্বন্ধে। কোন অপরাধের জন্য এপোলোদেব হরাক্লেশকে শাস্তি দেবার জন্য আক্রমণ করেন। হেরাক্লেশ অপরাধ অস্বীকার করে এপোলোদেবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। দেবাদিদেব যুধ্যমান মহাবলীদের মধ্যে একটি বজ্র ফেলে যুদ্ধ বন্ধ করেন ও অপরাধের জন্য ইউরেস্থিয়াসের আদেশ অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করতে হেরাক্লেশকে বাধ্য করেন। ইউরিস্থিয়াসের আদেশে হেরাক্লেশকে বারটি কঠিন কর্তব্য পালন করতে হয়। এই বারটি কর্তব্যই "এ্যাথ্‌লো" নামে খ্যাত।

'এ্যাথ্‌লো' এই গ্রীক শব্দটির বাংলা মর্মার্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা পুরস্কার। এ্যাথ্‌লো থেকেই এ্যাথ্‌লেট শব্দের উৎপত্তি। এই এ্যাথলো বা এ্যাথ্‌লেট শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মহাবলী হেরাক্লেশের কঠিন ক্লেশকর প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্মৃতি।

এলিসের রাজা আগিয়াসের পশুশালা একদিনের মধ্যে পরিষ্কারের নির্দেশ পালন এই বারটি কর্তব্যের মধ্যে একটি। রাজা আগিয়াসের অগণিত গৃহপালিত পশু ছিল। আদেশ অনুযায়ী হেরাক্লেশকে বৎসরের পর বৎসর সঞ্চিত আবর্জনা রাশি কারও সাহায্য না নিয়ে পরিষ্কার করবার সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল। রাজাও এ কাজ অসম্ভব মনে করে আবর্জনা পরিষ্কৃত হলে হেরাক্লেশকে পশুশালার এক দশমাংশ পশু দান করতে প্রতিশ্রুত হলেন।

হেরাক্লেশ একদিনের মধ্যেই তার এ্যাথ্‌লো সম্পাদন করে ফেল্লেন। রাজার কাছে চাইলেন প্রতিশ্রুত এক দশমাংশ পশু। রাজা দিতে অস্বীকার করে জানালেন. হেরাক্লেণ ইউরেস্থিয়াসের নির্দেশ মত তার এ্যাথ্‌লো সম্পাদন করেছেন তাই পশু দান করবার কথাই ওঠে না। হেরাক্লেশ কুপিত হলেন কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। ধীরে ধীরে সৈন্য সংগ্রহ করে একদিন অতর্কিতে এসে এলিস রাজ্য আক্রমণ করলেন এবং সবংশে এলিসের রাজাকে নিহত করে এলিস রাজ্য অধিকার করলেন। এই বিজয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য হেরাক্লেশ এলিসের আলফিউস নদীর তীরবর্তী প্রান্তরে এক আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অন্যান্য আনন্দ অনুষ্ঠানের মত এখানেও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কর্মসূচীর প্রধানতম অঙ্গ ছিল। প্রতিবৎসর এই দিনটির স্মরণে

*গ্রীক ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাবলী। রোমানরা হেরাক্লেশকে হারকিউলিস নামে অভিহিত করত। সেই থেকেই হেরাক্লেশ হারকিউলিস নামেই অধিক পরিচিত।

দেবাদিদেবের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য আলকিউসের প্রান্তরে যে মহাপূজা, আনন্দ অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হত তাই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা বলে দ্বিতীয় মত প্রচলিত। অলিম্পিয়ার জিউসদেবের মন্দিরের প্রাঙ্গণে হেরাক্লেশ কর্তৃক রোপিত ক্যালিষ্টোফানোস পবিত্র অলিভ বৃক্ষ—হেরাক্লেশের প্রতি সম্মানে এই বৃক্ষ থেকেই পত্র চয়ন করে পরবর্তী কালে অলিম্পিক বিজয়ীর মস্তকের মাল্য নির্মিত হত।

এ সম্পর্কে পিণ্ডারে চারণ গাথা এই প্রমাণের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

উপকথার চতুর্থ বিবরণী পেলোপস্ ও ওয়েনোমাসের স্মরণীয় রথ প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত। পিসার রাজা ওয়েনোমাস তাঁর পরমাসুন্দরী কন্যা হিপ্পোডামিয়ার বিবাহের জন্য এক অদ্ভুত প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে যে কুশলী বীর রথের গতি প্রতিযোগিতায় ওয়েনোমাসকে পরাজিত করতে পারবেন তার সাথে হিপ্পোডামিয়ার বিবাহ দিতে তিনি প্রতিশ্রুত হন। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী প্রতিযোগীকে হিপ্পোডামিয়াকে রথে বসিয়ে রথ পরিচালনা করতে হত এবং কিছুক্ষণ পরেই ওয়েনোমাস একটি জেভেলিন হাতে নিয়ে নিজের রথে প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনুসরণ করতেন ও প্রতিযোগীর সম্মুখীন হওয়া মাত্র জেভেলিন নিক্ষেপ করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করতেন। রুধিরাক্ত পরিচ্ছদে হিপ্পোডামিয়া পিতার রথে রাজপ্রাসাদে ফিরে আসতেন। কিন্তু অপরূপ লাবণ্যময়ী হিপ্পোডামিয়ার আকর্ষণ গ্রীক যুবকদের এমন মোহাবিষ্ট করে তুলেছিল যে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও পাণিপার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত হন নি।

শেষ পর্য্যন্ত তেরটি হতভাগ্য প্রাণিপ্রার্থী যুবক* ওয়েনোমাসের তীক্ষ্ম জেভেলিনের আঘাতে নিহত হওয়ার পর পেলোপস্ নামে এক বীর যুবক এগিয়ে এলেন। তিনি প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন সোজা পথে ওয়েনোমাসকে পরাজিত করবার কোন উপায়ই নেই তাই ওয়েনোমাসের রথের সারথিকে উৎকোচের লোভে বশীভূত করলেন। রথ প্রতিযোগিতার অল্পক্ষণ পূর্বে সারথি ওয়েনোমাসের রথচক্রসংযুক্ত কীলক দুটি অপসারণ করে সেখানে মোমের কীলক প্রবিষ্ট করে রাখে।

* অশুভ ত্রয়োদশ (unlucky thirteen)—শেষ নিহত প্রতিযোগী সংখ্যা গণনায় ত্রয়োদশ হওয়ায় এর পর থেকে অশুভ ত্রয়োদশ দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক বলে জনসমাজে প্রচলিত হয়।

প্রতিযোগিতার সময় তীব্রগতিতে ধাবমান ওয়েনোমাসের দুটি রথচক্রই রথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও রথটি সম্পূর্ণ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে ওয়েনোমাসও মৃত্যু বরণ করেন। পেলোপস্ হিপ্পোডামিয়াকে বিবাহ করেন এবং এই রথ প্রতিযোগিতায় বিজয়ে পিতামহ জিউসদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য অলিম্পিয়ার প্রান্তরে যে প্রতিযোগিতা সুরু করেন সেই প্রতিযোগিতাটিই প্রথম অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বলে এই তৃতীয় মতটি প্রচলিত।

উপকথার এ সব কাহিনী থেকে একটি সত্য পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, সেটি হল খৃষ্ট জন্মের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব থেকেই দেবাদিদেব অলিম্পিয়ান জিউস দেবের সম্মানে অলিম্পিয়া অর্থাৎ স্বর্গভূমির প্রান্তরে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছিল।

[চলবে]

মেক্সিকো অলিম্পিকের টুকিটাকি

এবারে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার বিশেষত্ব হল মেক্সিকানরা প্রত্যেকটি ব্যাপারে গতানুগতিক ভাবে না চলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই জাতীয় ভাবধারার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। প্রস্তুতি কমিটির প্রধান এবং বিশ্ববিখ্যাত স্থপতিবীদ পেড্রো রামিরেজ ভাজকুয়েজ জানিয়েছেন মেক্সিকানরা নিজস্ব ভঙ্গিতেই প্রতিযোগিতা পরিচালিত করতে ইচ্ছুক। তাঁর মন্তব্য অনুযায়ী "আমরা বিশাল বিশাল ইমারত প্রথম থেকেই তৈরী করে এবং এগুলিকে খালি রেখে অর্থের অপচয় করতে চাইনা। তাতে হয়তো সমগ্র বিশ্বের প্রশংসা পাওয়া যেতে পারে কিন্তু জনসাধারণ থেকে সংগ্রহ করা অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হবে না।" ফলে প্রতিযোগিতার আর মাত্র তিনমাস বাকী থাকলেও ষ্টেডিয়াম ক্রীড়াসৌধ ইত্যাদি তৈরীর কাজ এখন পূরাদমে চলছে। নিচে বিভিন্ন ষ্টেডিয়াম এবং ক্রীড়াসৌধ ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

উদ্বোধন ও সমাপ্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ইউনিভার্সিটি ষ্টেডিয়ামে। এজন্য ইউনিভার্সিটি ষ্টেডিয়ামকে নূতন করে পরিমার্জিত ও সুসংস্কৃত করা হয়েছে। দর্শকদের বসবার আসন বাড়িয়ে কিঞ্চিদধিক ৮০,০০০ করা হয়েছে। এখানে এ্যাথ্লেটিক প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে।

বর্তমানে প্রচলিত রেড সিণ্ডারের ট্রাকের (লাল কাঁকর বিছান দৌড়াবার

নির্দিষ্ট পথ) বদলে টার্টান নামে অধিক ক্ষমতা সহনক্ষম এক রকম রাসায়নিক কৃত্রিম ধরনের মাটির উপর ট্রাক নির্মাণ করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি পরীক্ষামূলকভাবে টার্টানের ট্রাক নির্মাণের স্বপক্ষে মত প্রদান করেছেন।

ফুটবলের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে ষ্টেডিও অ্যাজটেকা। মোট ১,০৫,০০০ দর্শকের

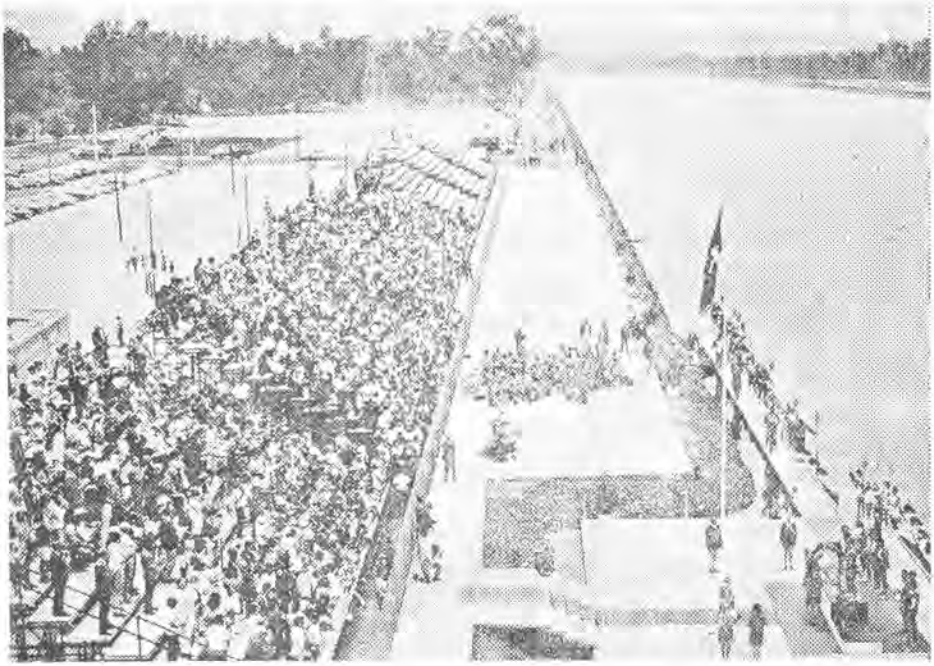

অলিম্পিকে ইয়টিং ও ক্যানোয়িং প্রতিযোগিতার জন্য বিস্তীর্ণ জলাশয়।

উপযোগী করে ষ্টেডিয়ামটি নির্মিত হয়েছে। দূর থেকে মনে হবে একটি কংক্রিটের স্তূপ। কিন্তু কাছে এলে দেখা যাবে ভাস্কর্য্য সত্যই অপরূপ। ষ্টেডিয়ামের বিভিন্ন ব্লক বিভিন্ন রং-এ রঞ্জিত। সুন্দর সবুজ তৃণাবৃত মাঠকে ঘিরে আছে টার্টানের ট্রাক। বিভিন্ন স্থানে সুরঙ্গের মধ্য দিয়ে ষ্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে হবে কিন্তু এমন সুন্দরভাবে বেরোবার রাস্তা করা হয়েছে যে মাত্র আঠার মিনিটের মধ্যে ষ্টেডিয়ামটি খালি হয়ে যাবে।

গ্যালারির মাঝে অনেকগুলি ডালাকৃতি ব্লক আছে। প্রত্যেক ব্লকে দশজনের

বসবার জায়গা। ৯৯ বছরের জন্য এগুলি ভাড়া দেওয়া হয়েছে। ফলে ষ্টেডিয়াম তৈরীর সময় এই ব্লকের ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অগ্রিম অর্থে ষ্টেডিয়াম তৈরীর কাজ সুগম হয়েছে। প্রত্যেকটি ব্লকের পিছনে ছোট বিশ্রাম ঘর ও রান্নাঘরও আছে। অবশ্য এগুলির ভাড়া এত বেশী যে সাধারণের নাগালের বাইরে। এই সব ব্লকে সোজা মটর নিয়ে ওঠা যায় ও মোটর রাখবার গ্যারেজও আছে। যাঁরা এ সব ব্লক ভাড়া নিয়েছেন তাঁরা ৯৯ বছর পর্য্যন্ত বিনামূল্যে ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সমস্ত খেলা দেখতে পাবেন। এই ষ্টেডিয়াম নির্মাণের কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য শেয়ার বিক্রয় করা হয়েছে এবং প্রধানতঃ বেসরকারী শেয়ার ক্রেতাদের অর্থেই এই ষ্টেডিয়ামটি গড়ে উঠেছে

ইউনিভারর্সিটি ষ্টেডিয়ামের পাশেই নির্মিত হয়েছে জলক্রীড়ার জন্য জাকেটেঙ্কো অলিম্পিক পুল। এখানে বিভিন্ন ধরনের জলক্রীড়ার জন্য (সন্তরণ, ডাইভিং ওয়াটার পোলো ইত্যাদি) বিভিন্ন আকারের সুইমিং পুল। ষ্টেডিয়াম ডাইভিং বোর্ড স্থাপিত হয়েছে এবং পর পর কয়েকটি আন্তর্জাতিক সন্তরণ প্রতিযোগিতার পর কিছু কিছু পরিবর্তন করে সুইমিং পুল ও ষ্টেডিয়ামের উৎকর্ষতা সাধন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সুইমিং ফেডারেশন বর্তমান ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ওয়াটার পোলো খেলবার জন্য পর পর ছয়টি পুল নির্মিত হয়েছে এবং এগুলি নিয়ে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে

———

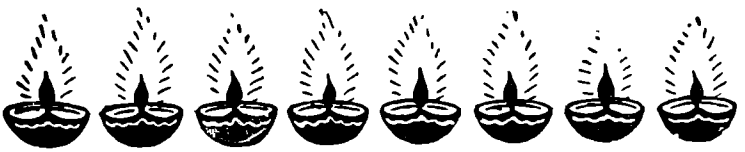

প্রফুল্লচন্দ্র

নৃপেন আকুলি

তুমি এ জাতির উজ্জ্বল বর্তিকা,
স্মৃতির বেদীতে নিষ্কম্পিত শিখা।
প্লাবনে কিংবা দুর্ভিক্ষের মাঝে—
দেখেছি তোমায় পুণ্য সেবার কাজে।

শুধু পুঁথিগত শিক্ষাই শ্রেয় নয়;
আত্মজ্ঞানের চাই দৃঢ় প্রত্যয়!
পরাণুকরণে নিমগ্ন থাকে যারা,
আত্মবলের বলিদান করে তারা।

প্রতি পদে তাই বলিষ্ঠ আচরণে
স্বাবলম্বন শিখায়েছ জনে-জনে।
প্রণাম তোমায় জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক,
কর্মযোগের সুমহান ঋত্বিক!

———

প্রতীক্ষা

হরিদাস দাশগুপ্ত

ঝর ঝর ঝর ঝরে শ্রাবণের ধারা—
চারিদিকে জেগে ওঠে জলের পাহারা,
নারকেল ডালে বসে কাক ভিজে সারা
ভেককুল কলরবে মাতাইছে পাড়া।
গুরু গুরু মেঘ ডাকে দামিনী চমকে,
আকাশেরে কালো হেরি পথিক থমকে
নয়ন ধাঁধিয়া তার অশনী ঝলকে,
ময়ূর ময়ূরী শুনি নাচিছে পুলকে।
কেগো তুমি বাতায়নে নয়ন পাতিয়া
অবিরল বারিধারা দেখিছ চাহিয়া,
গুরু গরজনি দুরু দুরু হিয়া,
প্রিয়জন আসিবে না তরণী বাহিয়া।
ঝর ঝর ঝর ঝরে শ্রাবণের রাতি,
বাতায়ন ধারে কে গো রহ আঁখি পাতি।

———

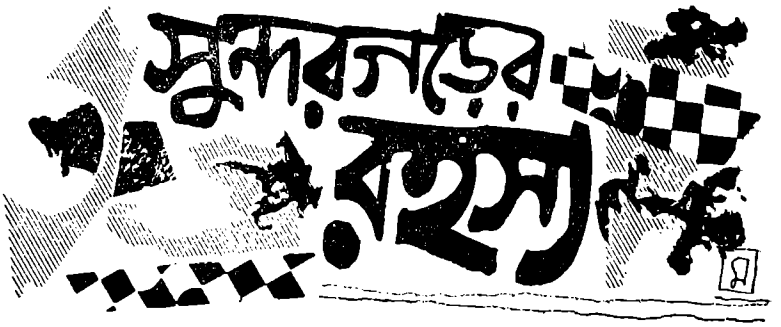

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অরবিন্দ সুজিত ও সুদেব একটু পরে বেরিয়ে পড়ল। যাবার সময় হরিদাস বলে দিল, একটু সাবধানে যাবেন হুঁজুরেরা। সমর রায়ের কথা শুনে একটু ভাবিত হয়ে পড়ছি। কি মতলব নিয়ে আসছে। তাছাড়া জঙ্গলের ভেতরে যাবেন না বড় বাঘের উপদ্রব।

সুজিত বলল, আমার কাছে পিস্তল আছে।

হরিদাস হেসে বলল, পিস্তল দিয়ে বাঘ মারা যাবে না হুঁজুর। বাঘ মারতে গেলে বড় রাইফেল চাই।

সুজিত দিনের আলোয় সুন্দরগড়কে ভাল করে দেখল। চারিদিকে ধূ ধূ করছে ফাঁকা মাঠ। মাঠ পেরিয়ে ঘন জঙ্গল।

ওরা গেট দিয়ে বইরের রাস্তায় এসে পড়ল। এখান থেকেই জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে।

অরবিন্দ বলল, এখানে ডানদিকে একটি রাস্তা আছে একেবারে সমুদ্রের ধারে চলে গিয়েছে। রাস্তাটা বার করতে হবে।

তিনজনে কিছুদূর এগিয়ে যেতে একটি রাস্তা পেল। পায়ে চলা সরু পথ।

ওরা তিনজন গল্প করতে করতে এগুতে লাগল। ওরা দেখতে পেল কয়েকটি লোক এগিয়ে আসছে। দেখে মনে হয় স্থানীয় অধিবাসী। কাঁধে কুড়োল।

সংখ্যায় তারা তিনজন।

লোকগুলো সুজিতদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। মনে হল এই জঙ্গলের মধ্যে তিনজন শহুরে ছেলেকে দেখে ওরা অবাক হয়ে গিয়েছে।

সুজিত বললো, কোথায় যাচ্ছো কর্ত্তারা ?

কাট কাটতি।

কোথায় থাকো ?

মীর বল্লভপুর। আপনারা কোথায় ? পাগলাবাবুর ওখানে এয়েছেন বুঝি ?

হ্যাঁ।

আহা, বড় ভাল মনিষ্যি ছিলেন পাগলা বাবু। একটু ক্ষ্যাপাটে তবু বড় ভাল লোক। তেনার কাছে কত লোক আসত। তিনি মারা যাবার পর সবতো শ্মশান হয়ে গেল। তা আজ আবার দেখলাম অনেক লোক আসছেন।

অনেক কোথায় হে ? আমরাতো মোটে তিনজন।

সুমুদ্দুরের ধারে লঞ্চে এক বাবু আর এক চাকর পানা লোক দ্যাখলাম যে। সুজিত অধীর আগ্রহ চেপে রেখে বলল, লঞ্চটা কোথায় ?

দ্যাখলামতো সুমুদ্দুরের ধারে রয়েছে। আমি ভাবলাম আপনারাও ঐ লঞ্চের লোক।

সুদেব জিগ্যেস করল, সুমুদ্দুর কতদূর এখান থেকে ?

তা এক কোরোশ হবানি।

জঙ্গলে বাঘ আছে নাকি ?

বাঘ কনে ? সে আপনি বাদায় গেলি তবে বাঘ দেখতি পাবেন। একেনে জানোয়ার বলতি দাঁতাল বুনো শুয়োর আর কালকেউটে।

সুজিত বলল, আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ কর্ত্তারা।

অরবিন্দ বলল, সুজিত মনে হচ্ছে সমরবাবু লঞ্চ নিয়ে এসেছেন। আমরা ভাবছিলাম লোকটা কোথায় গেল ?

জঙ্গল ধরে প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর সমুদ্র গর্জন ওদের কানে এল। নীল আকাশ, সবুজ বন আর নীল সমুদ্র এখানে মিশে গিয়েছে।

আর একটু এগুতেই চোখে পড়ল সমুদ্র আর তার তীরে সত্যিই একটা লঞ্চ দাঁড়িয়ে। সুজিত তাড়াতাড়ি একটা গাছের উপর উঠে সব ভাল করে দেখে নিল। সমুদ্রের তীরে বালিয়াড়ি ঘেষে জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে। কোথাও জনমানবের বসতি নেই।

হঠাৎ অস্ফুট কণ্ঠে সুজিত ডাকল, সুদেব, অরবিন্দ দেখ, দেখ।

ওরা তাড়াতাড়ি গাছে উঠতেই দেখতে পেল লঞ্চের ডেকে দাঁড়িয়ে আর কেউ নয় সমর রায়। সুজিত বলল, সুদেব আজ অমাবস্যা। কালকেই বলেছি একটা কিছু অঘটন আজ ঘটতে পারে। সমরবাবু এমন সুযোগ নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবেন না। সুতরাং চল আমাদের এখুনি গিয়ে আজকের রাতের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

সুজিত ফেরার সময় গম্ভীর হয়ে ভাবতে ভাবতে চলল। মনে মনে সে একটা দারুণ শক্ত অঙ্ক কষে ফেলেছে। এখন উত্তরটা শুধু উত্তর মালার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া বাকী।

সুন্দরগড়ে ফিরতেই হরিদাস বলল, আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন জঙ্গলের মধ্যে? আমিতো ভেবে মরি। শেষে নিজেই আপনাদের খোঁজে যাব বলে ভাবছিলাম।

সুজিত বলল, না, আমাদের পথ চিনতে কোন অসুবিধা হয়নি। একেবারে সমুদ্র পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, সমুদ্রের ধারে একটি লঞ্চ দেখলাম। এখনে লঞ্চ নিয়ে কারা আসে বলতে পারেন?

সুজিত লক্ষ্য করল লঞ্চের কথা শুনে হরিদাস যেন চমকে উঠল।

সে বলল লঞ্চ? তারপর নিমেষের মধ্যে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বলল, কী-জানি, এখানেতো কেউ লঞ্চ নিয়ে আসেনা। অনেক আগে মাঝে মাঝে সরকারী মাছধরার লঞ্চ এখানে এসে থামত বলে শুনেছি। কিন্তু আমি আসার পরতো লঞ্চের কথা কিছু শুনিনি। আচ্ছা লঞ্চে কাউকে দেখলেন?

অরবিন্দ কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সুজিত তাকে আড়ালে ইশারা করে থামিয়ে দিল।

সে বলল, না, কাউকে আমাদের চোখে পড়েনি। হয়ত ভেতরে কেউ থাকতে পারে কিন্তু আমরা আর বেশীদূর এগুইনি।

সুজিত অরবিন্দকে কতগুলি প্রশ্ন করতে শিখিয়ে দিয়েছিল। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর অরবিন্দ হরিদাসকে বলল, তোমার সঙ্গে কতগুলি জরুরী কথা আছে হরিদাস তুমি একবার আমার ঘরে এস।

হরিদাস একটু পরেই ওদের ঘরে এসে হাজির হল।

অরবিন্দ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা হরিদাস, ব্রিজ সিং বড় ভাল লোক ছিল। আমার দাদামশায় ব্রিজ সিংকে খুব পছন্দ করতেন তাই না ?

হরিদাস বলল, হ্যাঁ, হুঁজুর, ব্রিজ সিং তাঁর খুব বিশ্বাসী লোক ছিল।

আচ্ছা, ব্রিজ সিং এর কোন আত্মীয়স্বজন আছে ?

যতদূর জানি নেই। কারণ ব্রিজ সিং-এর মুখে তার কোন আত্মীয় স্বজনের নাম শুনিনি।

ব্রিজ সিং কোন ঘরে থাকত ?

বাইরে দেউড়ির পাশে এখন যেখানে রনজিৎ সিং থাকে। ওই ঘরের পাশে ছিল ব্রিজ সিং এর ঘর।

ঘরটা এখন তালাবন্ধ পড়ে আছে। জগজিৎ সিং ভয়ে ওই ঘরে ঢোকেনা।

ব্রিজ সিং কত মাইনে পেত ?

পঞ্চাশ টাকা আর থাকা খাওয়া।

অরবিন্দ এবার প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করে বলল, শোন হরিদাস আমরা এখানে আপাতত কিছুদিন থেকে যেতে চাই। কারণ সুন্দরগড়ের সম্পত্তি আমরা কাউকে না কাউকে লীজ দিতে চাই। তার আগে আমরা এখানে কয়েকদিন থেকে একটা হিসাব নিকাশ করে যেতে চাই। সুন্দরগড়ের সম্পত্তির মধ্যে কি কি আছে, দাদামশাইর অস্থাবর সম্পত্তিও বা কত তা আমরা ভাল করে জেনে যেতে চাই।

হরিদাস অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়ে বলল, বেশতো হুজুর। আপনার বাড়ি আপনি থাকবেন এতে আর আপত্তি কি। তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি তেমন কিছুতো কর্ত্তামশায় রেখে যাননি। গোটাকয়েক ভাল চেয়ার টেবিল আলমারি। আমি এসে দেখি

কর্ত্তা মশায়ের কোন আয় বলতে নেই। পোলট্রিও ভাল চলছে না। টাকা পয়সাও তেমন হাতে ছিল না। আমারই তিনমাসের মাইনে বাকী পড়েছিল। তবু আমি হাসিমুখে কাজ করে গিয়েছি।

কর্ত্তাবাবুর অত শখের সম্পত্তি বলে মনটা একটু খারাপ হয়ে যায় হুঁজুর। তবে আপনাদের ব্যাপার যা খুশী করবেন আমার কিছু বলা সাজেনা।

কিছুক্ষণ পরে হরিদাস চলে গেলে সুজিত বলল, ঠিক আছে। তোমার প্রশ্নগুলো সবই ঠিক ঠিক হয়েছে। আচ্ছা অরবিন্দ তোমার দাদামশায় কি খেতে ভালবাসতেন বলতে পার?

অরবিন্দ বলল, পায়েস। যতদূর মনে পড়ে প্রায় বড় এক বাটি পায়েস দাদামশায় খেয়ে নিতে পারতেন।

সুজিত বলল, ঠিক আছে।

একটু পরে হরিদাস এলে সুজিত বলল, হরিদাস আজ রাতে আমাদের পায়েস খাওয়াতে পার। হরিদাস বলল, কেন পারব না হুঁজুর। তবে গুড়ের পায়েস হবে। এখানেতো আমরা চিনি পাইনা।

ঠিক আছে তাই সই। আর শোন, রাতে কিন্তু আজ আমরা একসঙ্গে বসে খাব।

রাতে সত্যি সত্যি হরিদাস পায়েসের ব্যবস্থা করল। একসঙ্গে খেতে বসল সকলে। সুজিত দেখল হরিদাস নেহাৎ কম যায় না। বড় বাটির এক বাটি পায়েস ও একাই খেয়ে ফেলে দিল।

অরবিন্দ বলল, বাঃ বড় সুন্দর পায়েসটা হয়েছে, দাদু বড় পায়েস খেতে ভালবাসতেন।

হরিদাস বলল, হ্যাঁ, হুঁজুর তাঁর কাছ থেকেই আমার পায়েস রাঁধতে শেখা। কর্ত্তামশায়তো পায়েস বলতে অজ্ঞান ছিলেন।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ওরা শুতে গেল, অরবিন্দ বলল, সুজিত, দু রাত্তির তো সুন্দরগড়ে কেটে যাবার যোগাড় হল। কিন্তু রহস্যের কিছু কিনারা করতে পারলে। আমারতো মনে হয় কাল সকালে আমরা সবাই গিয়ে সমর রায়কে চ্যালেঞ্জ করি, কেন তিনি এভাবে আমাদের পিছু নিয়েছেন।

সুজিত বলল, তার কোন দরকার নেই। মনে হয় সমর রায় আজ রাতে নিজেই

সুন্দরগড়ে আসবেন।—অরবিন্দ বলল, বল কি সুজিত ?

হ্যাঁ, একটু পরেই দেখতে পাবে। দেখ অরবিন্দ যে কোন কারণেই হোক হরিদাস সমরবাবুকে সুন্দরগড়ের ভেতরে যেতে দিতে চায় না। সমর রায়ও চায় সুন্দরগড়ে আসতে। এবং সে চায় সুন্দরগড়ের সম্পত্তি।

ব্যাপারটা কি রকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সমররায় সুন্দরগড়ের সম্পত্তি চায় এবং আমরা যাতে সুন্দরগড় না আসি তার জন্য সে এপর্যন্ত নানাভাবে আমাদের ভয় দেখিয়ে এসেছে। কিন্তু স্টেটসম্যানে আর আনন্দবাজারে সেই বিজ্ঞাপনটা তাহলে কে দিচ্ছে ?

সুদেব বলল, আমারতো সন্দেহ হচ্ছে হরিদাসকে সুন্দরগড়ের সম্পত্তি বিক্রি হয়ে যাক ও তা চায়না।

অরবিন্দ বলল, কেন ? কি ওর স্বার্থ ? এমনকি ওর চাকরি যাবারও ভয় নেই।

সুদেব বলল, তা নেই। তবে সুন্দরগড়ের ব্যাপারে তার কোন স্বার্থ জড়িত আছে বলে মনে হচ্ছে।

অরবিন্দ বলল, কী সে স্বার্থ ?

সুদেব বলল, সেটাইতো খুঁজে বার করতে হবে।

সুজিত ওদের কথা শুনছিল। সে কোন কথা বলছিল না।

অরবিন্দ বলল, সুদেব কি ঘুমিয়ে পড়ল ?

সুজিত বলল না। তবে তোমরা এবার ঘুমোবার চেষ্টা কর। অন্তত ঘুমোবার ভাণ কর।

অরবিন্দ, সুজিত আজ রাতে সুন্দরগড়ে কোন ভয়ংকর নাটকের অভিনয় হতে পারে।

ওরা ঘুমোবার ভাণ করল। রাত তখন বারোটা। শোনা যাচ্ছে ঝি ঝি পোকার ডাক। ঝি-ঝি-ঝি। একটা অশান্ত কলতান। কোথা থেকে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। তারপর নিস্তব্ধ।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে একটা কান্না ভেসে এল। কচি ছেলের কান্না। ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া।

অরবিন্দ ফিস ফিস করে বলে উঠল—সুজিত।

সজিত বলল, চুপ। তোমরা আমার সঙ্গে এস, সুদেব টরচটা আমার হাতে দাও।

দরজা খুলে ওরা বাইরে এসে দাঁড়াল। এখন আর কান্নার আওয়াজ শোনা

যাচ্ছেনা। হঠাৎ শোনা গেল একটা পায়ের শব্দ এদিকে এগিয়ে আসছে।

সুজিত বলল, সুদেব, অরবিন্দ এস এই থামের আড়ালে আমরা দাঁড়াই।

ওরা থামের অড়ালে দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলো একটি কালো কাপড়ে ঢাকা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে।

মূর্তিটা এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে তাদের সামনে দিয়ে চলে গেল।

তার পিছনে পিছনে গেল আর একটি মূর্ত্তি। দুই মূর্তি একজায়গায় দাঁড়িয়ে পরামর্শ করল। তারপর দুজন চলে গেল দুদিকে।

সুজিত ওদের দ্রুত অনুসরণ করল। ছায়ামূর্তি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেছে সুজিত অরবিন্দ ও সুদেব ওপরে উঠে গেল।

ওপরে বারান্দাটা ঘুরে ডানদিকে চলে গেছে। বারান্দার পাশে একটি ঘরের দরজার সামনে ছায়ামূর্তি গিয়ে দাঁড়াল।

সুজিত সুদেব ও অরবিন্দ একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে।

ছায়ামূর্তিটা এদিক ওদিক তাকিয়ে দরজাটা খুলতে চেষ্টা করল।

হঠাৎ কে যেন দ্রুত এগিয়ে এল, পিছন থেকে তার পিঠে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে বলে উঠল, হাত তোল সমর। ছায়ামূর্তি চমকে উঠে হাত তুলে বলল, কে ?

সেই অজ্ঞাত ব্যক্তি বলে উঠল, আমি ইন্দ্রনারায়ণ। ইন্দ্রনারায়ণ ? শয়তান ! তুমি তাহলে মরনি ?

মরেও আমি বেঁচে আছি সুন্দরগড়ের প্রতিটি ইঁটকাঠের মধ্যে আমি বেঁচে ভেবেছিলে আমি মরে গেছি তুমি এই ফাঁকে সুন্দরগড়ের সম্পদ ভোগ করবে তাই না? তা হতে দেবনা শয়তান।

শয়তান আমি না তুমি ? তুমি বেইমান। আমাকে বঞ্চিত করে সমস্ত সম্পত্তি তুমি একা ভোগ করতে চেয়েছ।

তোমার প্রাপ্য তোমাকে আমি দিয়েছি। কিন্তু তোমার লোভ বড় বেশী, তুমি তাতে সন্তুষ্ট হওনি। আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে। আজও তুমি সুন্দরগড় ধাওয়া করেছ। কিন্তু সুন্দরগড়ের জঙ্গলের মধ্যে তোমার এই দেহটা কাল সকালেই পড়ে থাকবে সমর। হঠাৎ একটা শব্দ হল গুড়ুম গুড়ুম। তারপর একটা আর্ত্তনাদ ! ইন্দ্রনারায়ণ লুটিয়ে পড়েছেন মাটিতে। [ক্রমশঃ]

শ্রাবণে-প্লাবনে

সরল দে

ষাট বছরের রেকর্ড ভেঙে
যেই মা গেল আষাঢ়,
অমনি ভরা শ্রাবণ এল—
কথাই ছিল আসার।

ঝম্ ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি, আকাশ
মেঘ-থম্-থম্ করে,
মুখ বাড়ালেই সূয্যিমামা
হঠাৎ ঢাকা পড়ে।

পা বাড়ালে রাস্তা নেই—
জল ছল্-ছল্ নদী !
চল্ চল্ চল্ ইস্কুলে যাই
নৌকো মেলে যদি।

কদমডালে কদমফুল
যেন টেনিস্‌বল,
ও দাদা, তুই একটা পেড়ে
দিবি আমায় চল্॥

———

আজব ছড়া

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

(১)

আচ্ছা—
উড়ল ঘোড়ার বাচ্চা !
একটু কিছু নয়ক মিছু
সবটা তবে সাচ্চা ?
আস্ত গোটা মস্ত মোটা
চোস্ত ঘোড়ার বাচ্চা !

(২)

ছক্কা—
টক্কা টরে টক্কা—
খবর গেল চাচার কাছে
তোমার পরাণ অক্কা,
জান বাঁচাতে ছুটল চাচা
দিল্লী হতে মক্কা।

(৩)

ময়না,
খাঁচায় পাখি রয় না।
মাথার পরে শোলার টোপর
গলায় সোনার গয়না,
কেমন মানায় দেখতে তাকে
খুঁজে বেড়ায় আয়না।

———

ঠিক এগারোটায়

নির্মলেন্দু গৌতম

কড়া নাড়বার শব্দে দরজা খুলতেই দেখি সুধাময়। একখানা চিঠি আমায় দিয়ে সুধাময় বললো, 'দেবেশ্বরদা আপনাকে চিঠিখানা দিতে বলেছে।'

দেবেশ্বরের চিঠি আমি পাইনি কোনোদিন। বাইরে কোথাও গেলে কখনো-সখনো বাড়িতে চিঠি লেখে দেবেশ্বর। আমায় লেখেনা। এলে সবিস্তারে গল্প শোনায়।

কাজেই আমি চিঠিখানা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে বললুম, 'দেবেশ্বর কোথাও গেছে নাকি হঠাৎ করে?'

সুধাময় বললো, 'উহুঁ, এখানেই আছে।'

তাহলে চিঠি পাঠালো নিজে না এসে? ফের অবাক হয়ে শুধালুম আমি।

'এই মাত্র কোথায় বেরুলো যেনো।' সুধাময় বললো।

দেবেশ্বর কেনো চিঠি দিয়েছে তা সুধাময় জানলেও জানতে পারতো। কারণ দেবেশ্বরের সঙ্গে সুধাময়ের খাতির খুব। সুধাময়ের একটু আধটু নাটকের সখ আছে। দেবেশ্বর আবার সেই সখকে উসকে দেয়। এমন কি সুধাময়ের নাটক হলে আমাকেও দেবেশ্বরের সঙ্গে গিয়ে সামনের সারিতে বসে বেশ উঁচু গলায় সবাইকে শুনিয়ে সুধাময়ের প্রসংশা করতে হয়।

সুধাময়কে বললুম, 'বসবে নাকি?'

'না, বসবো না। আমার কাজ আছে অনেক। চলি আজকে।' বলে সুধাময় চলে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে দেবেশ্বরের চিঠিখানা আমি এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললুম।

চিঠিখানা পড়েই আমার ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হলো। জল তেষ্টা পেলো দারুণ। হাত পা কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মনে হলো।

দেবেশ্বর লিখেছে, স্কুলে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে আমি যেনো ঠিক এগারোটায় স্নান টান করে রেডি হয়ে থাকি। কিন্তু কিছু খাওয়া চলবে না। শুধু জল দিয়ে

গলা ভেজালে চলবে মাঝে মাঝে। তার বেশী নয়। দেবেশ্বর এসে সোজা ডাক্তারের বাসায় নিয়ে যাবে।

দেবেশ্বর কি আমার কোনো অসুখ টসুখ সন্দেহ করেছে? করতেও পারে। না করলে ডাক্তারের কাছে যাবার কথা বলবে কেন আর ডাক্তারের কাছে গেলেও এমন না খেয়ে যেতে বলবে কেন?

কোনো কোনো অসুখ নাকি নিজে বোঝা যায় না। আমিও বোধহয় আমার কোনো একটা অসুখ বুঝতে পারছি না। সেজন্যে দেবেশ্বর ডাক্তার ঠিক করে ফেলেছে নিশ্চয়ই পরীক্ষা করে দেখবে আমায়। এগারোটা পর্যন্ত না খেয়ে থেকে পরীক্ষা হবে।

আমার এমন একটা অসুখ হয়েছে যে আমি বুঝতে পারছি না। ভয়ে কেমন দুর্বল লাগছে নিজেকে। আমি ধরতে চেষ্টা করলুম আমার কি অসুখ হতে পারে! ধরতে চেষ্টা করতেই বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি সব অসুখ আমার মনে আসতে থাকলো। সেই বিচ্ছিরি অসুখগুলো হলে বাঁচাও মুশকিল!

একটা চেয়ারে বসে ঘামিয়ে প্রায় নেয়ে উঠলুম আমি! অনেক কষ্টে উঠে ফ্যানটা চালিয়ে দিলুম পুরো দমে। তবু আরাম লাগছে খানিকটা।

স্কুলে ছুটির দরখাস্ত আগামীকাল গিয়ে দিলেও চলবে। এখন দরখাস্ত লিখে কেউকে খুঁজে পেতে, তাকে দিয়ে সেখানা স্কুলে পাঠানো ভারি হাংগামার কাজ হবে। তাছাড়া অসুখের ভাবনাটা আমাকে এমন দুর্বল করে ফেলেছে যে আমার একপাও হাঁটতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আর অসুখটা নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর একটা কিছু। না হলে দেবেশ্বর আমায় আগেই খুলে বলতো ব্যাপারটা। আমি সত্যি সত্যি খুব ঘাবড়ে যাই মনে মনে। বুকের মধ্যে হাত দিয়ে দেখি বুক ধ্বক ধ্বক করে উঠছে নামছে।

দেবেশ্বরের চিঠিখানা আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ে ফেলি। না, দেবেশ্বর যে কথা লিখেছে তাতে ভরসা পাবার কিচ্ছু নেই। খালি পেটে ডাক্তারের কাছে যাওয়া নিশ্চয়ই ভরসার কথা নয়।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সাতটা বাজে।

শুয়ে শুয়ে একবার চা খেয়েছি বটে, কিন্তু আর কিচ্ছু খাওয়া হয়নি।

কিন্তু খেতেও ভরসা পাচ্ছি না যে। ইচ্ছেও হচ্ছে না একেবারে। দেবেশ্বর

যখন ডাক্তার, সময় ইত্যাদি সব কিছু ঠিক করে ফেলেছে, তখন কোনো একটা অসুখ আন্দাজ করেছে ঠিকই। চিঠি লিখে দেবেশ্বর আমায় আরো বেশী কাহিল করে ফেলেছে। অসুখের নামটা অন্ততঃ যদি একবার লিখতো তাহলেও ভরসা পাওয়া যেতো কিছুটা। সে অসুখে বাঁচে কিনা, বাঁচলেও কদ্দিন সে অসুখে ভুগতে হয় ইত্যাদি সব কিছু জেনে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো! দেবেশ্বর নিজে এলেও ঠিক ঠিক শোনা যেতো সব কিছু।

চেয়ারে হেলান দিয়ে পাখাটা চলতে থাকা সত্বেও ঘামতে থাকলুম আমি। খিদে টিদে একেবারেই ফুরিয়ে গেলো যেন। ভয়ে আমার সব ইচ্ছেই যেনো ফুরিয়ে যাচ্ছে।

সুধাময় বলেছে, দেবেশ্বর কোথায় যেনো বেরিয়েছে। দেবেশ্বর যদি বাড়িতে থাকতো তাহলে ট্যাক্সি করে চলে যেতুম তার কাছে। অসম্ভব খারাপ লাগছে আমার।

আটটা বাজতে বাজতেই কিন্তু ভয় ছাপিয়ে খিদে বেশ জোরদার হয়ে উঠলো পেটের মধ্যে। আর সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে যেনো জোরদার হয়ে উঠতে থাকলো সেটা। আমি নিজের দারুণ একটা অসুখের কথা সত্যি বলে ভেবে নিয়ে জোরদার খিদেটার সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে পড়লুম। কিন্তু জয়লাভ করবো এমন সাধ্য কি? যতোই লড়াই করতে লাগলুম, ততোই ক্ষেপে উঠতে থাকলো খিদেটা, ততোই শক্তিশালী হতে থাকলো।

আর কোনো উপায় না পেয়ে এবার দেবেশ্বরের লেখা চিঠিখানা চোখের সামনে টাঙিয়ে রাখলুম। চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে রইলো লেখাগুলো।

তাতেও কিছু হলো না। খিদেটা সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে তবু জোরদার হচ্ছে মনে হচ্ছে খিদের তো আর অসুখ হয়নি।

এমনি ভাবে নিশ্চয়ই আড়াই ঘণ্টা থাকা যাবে না আমি বুঝতে পারলুম। বই পড়লে কেমন হয়? বইয়ের মধ্যে থাকলে খিদের কথা হয়তো মনেই থাকবে না। উঠে একটা বই মুখে নিয়ে বসে পড়লুম। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার, গল্পের মধ্যেও লেমন্তন্ন বাড়ির বর্ণনা। এ সব যে খিদেরই চক্রান্ত, তা বুঝতে আমার বাকী থাকে না।

চেষ্টা করে ঘুমোতেও পারলুম না আমি। এই এমন স্বাস্থ্যবান খিদেকে পেটের মধ্যে খেপিয়ে রেখে কি ঘুমোনো যায়? মিছি মিছি খানিকটা সময় তাই চোখ বুঁজে রইলুম।

দেবেশ্বর এলো ঠিক পোনে এগারোটায়।

অসুখের ভয়টা এবার আবার আমায় কাহিল করে ফেললো। অসহায়ের মতো আমি দেবেশ্বরকে বললুম, 'আমার কী অসুখ তোমার মনে হচ্ছে দেবেশ্বর?'

দেবেশ্বর হেসে বললো, 'কোনো অসুখ তো তোমার হয়েছে মনে হচ্ছে না। আর অসুখ হবেই বা কেনো তোমার। দিব্যি স্বাস্থ্যবান ছেলে তুমি। নাও উঠে পড়ো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।'

দেবেশ্বর আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছে। আপাততঃ দেবেশ্বর আমায় ভেঙে বলবে না কিছু। আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলুম।

আমি দেবেশ্বরের সঙ্গে ট্যাক্সিতে চাপলুম। আমার বুকের মধ্যে এতো জোরে ঢিপ্ ঢিপ্ করছে ভয়ে যে আমি সীটে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে পড়ে রইলুম।

দেবেশ্বর একবার শুধালো, 'খুব খিদে পেয়েছে বুঝি?'

'তা আর বলতে!' আমি চোখ বুজেই বলি।

দেবেশ্বর বললো, 'খানিক পরেই সুদে আসলে সব পুষিয়ে নেবে।'

ফের আমায় উৎসাহ দিলো দেবেশ্বর। কিন্তু আমি উৎসাহ পাইনা। কারণ স্পষ্টই বুঝতে পারি আমাকে এমন কাহিল হয়ে পড়তে দেখেই দেবেশ্বর উৎসাহ দিচ্ছে।

আমি দেবেশ্বরের কথার কোনো উত্তর দিলুম না।

ফের দেবেশ্বর বললো, 'তুমি কিন্তু খুব কাহিল হয়ে পড়েছো।'

এবারও আমি কোনো উত্তর দিলুম না।

ট্যাকসি থামতেই দেবেশ্বর দরজা খুলে বললো, 'নেমে পড়ো।'

সারা শরীর আমার কাঁপছে। কী অসুখ কে জানে। হয়তো আর বাঁচবোই না ট্যাক্সি থেকে দুর্বল ভাবে নেমে পড়লুম আমি।

দেবেশ্বর ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিলো।

ডাক্তারের ঘর তেতলায়। অনেক কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে আমি দেবেশ্বরের পেছন পেছন উঠে এলুম। আমার মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করছে। একটু পরেই তো শুরু হবে পরীক্ষা।

ডাক্তার বাবু বাইরে বসে ছিলেন। আমাদের দেখতেই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, 'এই যে দেবেশ্বর, এসো। তোমাদের জন্যেই বসে আছি।

দেবেশ্বর হেসে বললো, 'আমার সেই বন্ধু।'

আমার দিকে তাকিয়ে দেবেশ্বর বললো, 'ছোরদার সেই বন্ধুর নাম বলিনি তোমায়, ডাঃ অরুণ চ্যাটার্জি ?'

আমি শুকনো গলায় বললুম, 'হ্যাঁ, চিনেছি এবার।'

দেবেশ্বর চেনাজানা ডাক্তার ঠিক করেছে তাহলে। আমি একটু খানি ভরসা পাই তবু।

ডাক্তার বললেন, 'আর দেরী নয় দেবু। তোমাদের বৌদি খাবার নিয়ে বসে আছেন। এসো তোমরা।'

'পরীক্ষা টরীক্ষা হবে না ?' বিস্মিত গলায় আমি শুধাই।

দেবেশ্বর আমার চেয়ে বেশী অবাক হলো। বললো, 'কীসের পরীক্ষা ?'

'ডাক্তারী পরীক্ষা! এতোক্ষণ তো সে জন্যেই কিচ্ছু না খেয়ে আছি। তুমি লিখেছিলে 'ডাক্তারের কাছে আসবে, সে জন্যে না খেয়ে থাকতে হবে!' আমি বলতে চেষ্টা করি।

হো হো করে হেসে উঠলো দেবেশ্বর। বললো, 'ওহো! খেতে নিষেধ করেছি এখানে আজ দারুণ একটা ভোজ আছে বলে। আর আমার একমাত্র বন্ধু বলে তোমার নেমন্তন্ন এই ভোজে। দীপুর পাশের জন্য ভোজ। তা তুমি যে বোকার মতো সত্যি সত্যি কিছু না খেয়ে অসুখ, পরীক্ষা ইত্যাদি ভেবে ফেলবে তা কি করে বুঝবো! অরুণদা দীপুকে ডাকুন তো। মজার কথাটা ওকে বলতে হবে

আমি ওদের কারো মুখের দিকে তাকালুম না।

উফ্, এতোক্ষণ, কি বিচ্ছিরি সব ভাবছিলুম। দেবেশ্বরের ওপর আমার দারুণ রাগ হচ্ছে। যদি চিঠিটার মধ্যে একজায়গাতেও ভোজের কথাটা লেখা থাকতো তাহলে কি আর এই নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো!

ফেরবার সময় ওর ওপর একহাত না নিয়ে কিছুতেই ছাড়বো না। আপাততঃ এতোক্ষণের এই কষ্টটাকে খাবার টেবিলে বসে পুষিয়ে নিতে হবে।

দেবেশ্বরের দিকে না তাকিয়েই তাই বললুম, 'আর দেরী করা ঠিক হবে না দেবেশ্বর।'

দেবেশ্বরও কথা না বলে পা বাড়ালো।

আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলুম ও হাসির দমকে ফেটে পড়ছে বলে 'চলো' কথাটাও বলতে পারছেনা !!

দেশের ডাকে

আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়

সজাগ মোরা থাকব সদাই দেশ রক্ষার তরে
রক্ষা করিব দেশের মাটীরে রণক্ষেত্র 'পরে।
কত কষ্টে অর্জিত মোর ভারত ভূমির স্বাধীনতা
একটু মাত্র ক্ষুণ্ণ না হয় সদাই লক্ষ্য রাখিব তা,
ভারতবাসী, শ্রমিক চাষী এস বিভেদ ভুলি
সকলে মিলে হাসি-মুখে জাতীয় পতাকা তুলি।

তরুণ চল, জানিনে ছল, গড়ব নতুন দল
শিখব যুদ্ধ হইব শুদ্ধ বাড়বে দেশের বল
মজুর ও চাষী ভারতবাসী—এস বিভেদ ভুলি
সকলে মিলে হাসিমুখে দেশের পতাকা তুলি॥

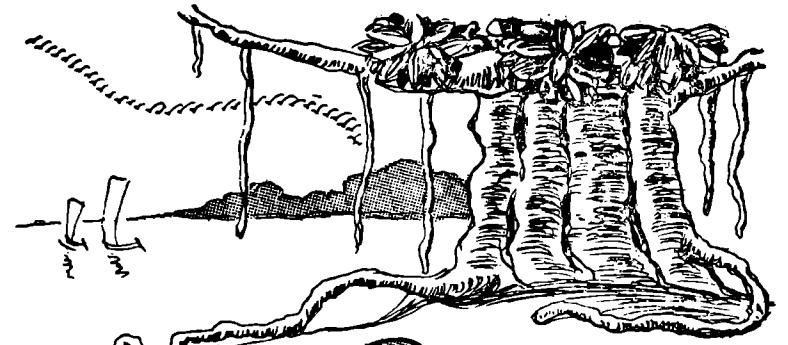

সোনালী স্বপন

স্বপনবুড়ো

কিশোর উপন্যাস

[নয়]

নতুন জলের ঢলে গাঁয়ে যেন একটা নরবলি হয়ে গেল।

মাছ ধরার মহোৎসবে ছোট্ট ছেলে বিন্তু স্রোতের মুখে প্রাণ দিলে—এই ঘটনায় সারা গাঁয়ের লোকের মন মর্মান্তিক বেদনায় যেন একেবারে থম্ থম্ করতে লাগ্‌লো।

কেউ কারো মুখের দিকে ভলো করে তাকাতে পারেনা। সবাই সকলকার কুশল প্রশ্ন করতে কুণ্ঠিত হয়।

নতুন জলের ঢলে মাছ ধরা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

বিশুর দাদু এই ঘটনার পর জলে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল। কিন্তু গাঁয়ের মোড়লরাই তাকে সময়মত ধরে ফেলে—ধরাধরি করে বাড়ী পৌছে দিয়েছে।

সে বুড়ো প্রায় পাগল হয়ে গেছে—; কিছুতেই ঘরের মধ্যে আটকা থাকতে চায় না; গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন বুড়ো একপা দু'পা করে ঘরের বাইরে চলে আসে। খালের ধারে চলে যেতে চায়।

এইভাবে দু'দিন তাকে অন্ধকার পথ থেকে ধরে নিয়ে ঘরের ভেতর কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে।

নইলে বুড়ো দাদু যে কখন পালিয়ে যাবে—তার কোনো স্থিরতা নেই!

সেই ঘটনার দুই দিন বাদে একটা বেতের ঝোঁপের মধ্যে বিশুর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেছে।

সেই মৃতদেহ যখন ছেলের দল ওপরে তুলে নিয়ে এলো—তখন সারা গাঁয়ের লোক একেবারে খালের ধারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

বিশুর যে খুদে খেলার সাথীর দল। তারা হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিলে।

আঘাতটা ছোটদের মনেই লাগে বেশী। তাই তারা যখন হাসে বা কাঁদে তখন একেবারে প্রাণ খুলেই নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করে। লোকে কি মনে করবে একথা তারা ভাবতে জানে না।

সেই খালের ধারে বিশুর মৃত দেহের সামনে ছোটদের সামলে রাখা মা-বাপেদের সত্যি অসাধ্য হয়ে উঠেছিল।

তারপর বিচ্ছুর দলও এগিয়ে এলো ছোটদের সান্ত্বনা দিতে।

তবু কি ওরা থাম্‌তে চায়?

বিশু ওদের খেলার সাথী, তার সঙ্গে ওরা আর খেলতে পারবে না,—ছোটদের ছোট্ট মনগুলিতে এই কথাটা দারুণ আঘাত করেছে!

শোক মুহ্যমান বাপ-মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে যার যার ঘরে চলে গেল।

এর পর আর এক বিপদ!

কোথা থেকে খবর পেয়ে বিশুর মা একেবারে পাগলিনীর মতো ছুটে এসে বিশুর সেই গলিত শরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তাকে তখন সেখান থেকে টেনে তোলা এক শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো।

বিশুর মা ছেলের শবদেহ জড়িয়ে ধরে যত চোখের জল ফেলে, গাঁয়ের বৌরা আঁচলে তত চোখ মোছে!

শেষকালে গাঁয়ের বৌরাই নিজেরা শান্ত হয়ে বিশুর মাকে এক রকম জোর করেই তার বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

তারপর এগিয়ে এলো ছেলের দল। সৎকারের সমস্ত ব্যবস্থা তারাই নিজেদের কাঁধে তুলে নিল।

গাঁয়ের নানা অঞ্চল থেকে শুকনো ডাল-পালা কেটে চিতার জন্য কাঠ জোগাড় করলে একদল ছেলে।

বাঁশ কেটে একটি ছোটখাটো খাটিয়ে তৈরী করে নিলে ছেলেরাই।

তারপর ওরা নিঃশব্দে বিশুর সেই শব তুলে নিয়ে নদীর ধারে শ্মশানে চলে গেল।

সারাটা গাঁয়ের মানুষ সেখানে গিয়ে হাজির হল। ওখানে পৌঁছে গাঁয়ের মোড়লরা ঘনঘন হরিধ্বনি দিতে লাগলো।

তাপর একসময় সকলের চোখের সামনে চিতা সাজিয়ে তাতে অগ্নি-সংযোগ করা হল।

লেলিহান শিখা উঁচু আকাশের পানে হাত বাড়াল। মনে হল যেন বিশুর কচি কচি আঙুল গুলো তার ভেতর লুকিয়ে থেকে আকু পাকু করছে!

গাঁয়ের ছোট বড় সকলের মনে হতে লাগ্‌লো তাদের বুকের পাঁজর যেন ওই ছোট বিশু খুলে নিয়ে চলে গেল।

অগ্নিশিখা আরো লেলিহান হয়ে উঠল। সেদিন গভীর রাত্রে সারা গাঁয়ের মানুষ চিতায় জল ঢেলে, তারপর নদীর জলে স্নান সেরে যে যার ঘরে ফিরে এলো।

সেই বিচ্ছুর দল নদীর ধারে সেই বটগাছের তলায় জমায়েৎ হয়েছে।

সেই লাঙল, জালি, মাকু, হাঁপর, চাকু, ব্যাদাম, র‍্যাঁদার দল—

লাঙল বল্লে, কিছু যেন আর ভালো লাগে না বিশুটা আমাদের একেবারে পাথর করে দিয়ে গেছে। মাকু বল্লে কোনো কাজে উৎসাহ নেই আমাদের।

হাঁপর নিজের মাথার চুলগুলো টেনে কইলে, কী আর বলবো তোদের দুবেলা খেতেও ইচ্ছে করেনা। ভাত যেন গলার ভেতর ডেলা পাকিয়ে ওঠে—

র‍্যাঁদা বল্লে, ঠিক বলেছিস তোরা। আমরা যেন পান্তা ভাতের মতো একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছি—

বাদাম ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের চেটোয় একটা কীল মেরে বল্লে, একটা কিছু

আমাদের করা দরকার নইলে আমরা একেবারে নিভে যাবো। আর কোনো কিছু করবার জোর আমাদের থাকবে না।

সবাই মাথা নেড়ে ওর কথায় সায় দিলে।

লাঙল বল্লে, একটা মজার বুদ্ধি আমার মগজে এসেছে—

সবাই উৎসুক হয়ে শুধোলে, কি রে কি? লাঙল উত্তর দিলে, এই সময় আমাদের গাঁয়ে অনেক রকম পাখী এসে হাজির হয়। আমাদের গাঁয়ের আশে-পাশের বন-বাদাড়েও হরেক রকম পাখীর যেন মেলা বসে যায়।

র‍্যাঁদা শুধোলে, তা হলে আমাদের কি করতে হবে—তাই বল না!

লাঙলের চোখে মুখে একটা ফন্দী যেন ফুটে বেরুচ্ছিল।

ওদের সবাইকার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বল্লে বসে বসে ত' আমাদের পায়ে একেবারে বাত ধরে গেল। চল, আমরা সব দল বেঁধে বন-জঙ্গলে ঢুকে পড়ি—

চাক জিজ্ঞেস করলে, তারপর?

—তারপর নানা কৌশল করে জাল দিয়ে নানা জাতের পাখী ধরতে হবে।

—তারপর?

—সেই সব রঙ-বেরঙের পাখী ধরে খাঁচা ভর্ত্তি করতে হবে।

—আচ্ছা, না হয় ভর্ত্তী করা গেল অনেক খাঁচা। কিন্তু সেই পাখীগুলো কী কাজে লাগবে?

লাঙল তখন চোখদুটো ছোট-ছোট করে বল্লে, তা হলে শোন বলি, ওরই ভেতর যে সব পাখী বোল শিখতে পারে—তাদের আমরা নানা রকম 'বোল' আর ডাক শেখাবো! "পড়ো নয়না পড়ো," "রাধা কৃষ্ণ বলো"—আরো সব রকমারী ডাক। তারপর আশে-পাশের হাটে-বাজারে আমরা সেইসব পাখী বিক্রী করতে পারবো।

হাঁপর লাফিয়ে উঠে বল্লে, হ্যাঁ, প্রস্তাবটা মন্দ নয়।

বাদাম ও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল,—হ্যাঁ, বন-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে পাখী ধরার মধ্যে একটা মজা লুকিয়ে আছে।

জালি ফোঁড়ন কেটে বল্লে, কিন্তু হাতে ত' আর পাখী ধরা যাবেনা। আগে সেজন্যে আমাদের তৈরী হতে হবে—

—কি রকম তৈরী ?

—ধরো পাখী ধরার প্রথম সরঞ্জাম হচ্ছে ছোট ছোট জাল তৈরী করা। এমন ভাবে সেই সব জাল গাছের পাতার মধ্যে বিছিয়ে দিতে হবে যে, ওরা টের না পায়—

—আরো একটা কাজ রইল আমাদের। নানা জাতের খাঁচা তৈরী করতে হবে। খাঁচা দিয়েও নানা উপায়ে পাখী ধরা যেতে পারে।

সবাই রাজি হয়ে গেল এই প্রস্তাবে। তখন বিচ্ছুর দল বাড়ীতে বসে খাঁচা তৈরী আর জাল তৈরী করার কাজে লেগে গেল।

ছেলেরা ঘরে বসে দিনরাত কাজ করছে—তাই দেখে ওদের মায়েরা কিন্তু খুব খুশী।

মায়েরা মনে মনে ভাবলে, দস্যিদের এইবার সুমতি হয়েছে। ওরা সব টো-টো করা ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে হাতের কাজ করছে।

পাছে ছেলেরা আবার বাউণ্ডুলে হয়ে পড়ে—সেই ভয়ে মায়েরা ছেলেদের তোয়াজ করতে সুরু করে দিল। নানা রকম পিঠে তৈরী করে ওদের মুখের কাছে ধরতে লাগলো। দুধ মাছের ও ব্যবস্থা করা হল।

বাড়ীর গিন্নিদের কাছে ছেলেদের সুমতি হবার কথা শুনে গাঁয়ের মোড়লের দল খুশী মনে গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানতে লাগলো।

ততদিনে বিচ্ছুর দল উদ্যোগ আয়োজন শেষ করে ফেলেছে।

ওরা একদিন খুব ভোরে উঠে পাখী ধরার জাল আর নানা রকম খাঁচা নিয়ে বন-বাদাড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

মায়েরা পেছন দিক থেকে ডাকছে'—ওরে তোরা দুধ মুড়ি কলা খেয়ে যা—! কোথায় তোরা যাচ্ছিস দল বেঁধে তাও ত' বলে যাচ্ছিস নে ! ভাতের থালা কতক্ষণ আগলাবো—সত্যি করে কয়ে যা—

কিন্তু কার কথা কে শোনে ?

ছেলের দল মহা উৎসাহে জঙ্গলের পথে উধাও হয়ে গেল !

সত্যি, বনের একটা আলাদা শোভা আছে।

বর্ষার জল পেয়ে গাছগুলো যেন ফন্ ফন্ করে বেড়ে উঠেছে।

সবুজ পাতাগুলোর ওপর ঝিলমিলে কাঁচা রোদ কেমন লুকোচুরি খেল্‌ছে। আর সেই সব গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে,—পাতার আড়ালে নানা জাতীয় পাখীর কলরব শোনা যাচ্ছে।

কিন্তু ওরা কেউ কবি নয়।

এই অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে কবিরা হয়ত খাতা পেন্সিল নিয়ে কবিতা লিখ্‌তে বসে যেতো।

কিন্তু বিচ্ছুর দলের ত' সে দিকে কোনো মন নেই।

তারা তাড়াতাড়ি ছোট ছোট জাল গাছের নানা ডালে এমন ভাবে ছড়িয়ে দিল যাতে চট্‌করে বাইরে থেকে দেখা না যায়।

তারপর খাপ্‌টি মেরে এখানে ওখানে ঝোপে-জঙ্গলে চুপচাপ বসে রইল।

এই পাখী আসে—এই পাখী আসে—ওরা যেন এক মনে পাখীর নাম জপ করতে লাগল—

ওরা যদি পাখী ধরতে না এসে শুধু বনে জঙ্গলে পাখী দেখ্‌তে আস্‌তো তাহলে ছেলেদের দু'চোখ আনন্দে ভরে উঠত।

ওই যে হলদে পাখীটা ল্যাজ দোলাচ্ছে—পাতার অড়ালে কোন পাখীটা সুন্দর শিস্ দিচ্ছে—

টিয়া—ময়না—বুল্‌বুলি—

এমন কি ওদের চিরদিনের চেনা শালিকপাখী পর্যন্ত লাফিয়ে লাফিয়ে কেমন সুন্দর ডাক ডাক্‌ছে—

ওরা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে এই মন-মাতানো দৃশ্য দেখতে লাগলো।

হঠাৎ একটা বান এ.সে লাগলো র‍্যাঁদার পিঠে—

আর্ত্তনাদ করে উঠল র‍্যাঁদা—

একদল বুনো লোক কোন সময় যে বনে-জঙ্গলে ঢুকেছে পাখী শীকার করতে তা ছেলের দল মোটেই টের পায়নি!

ছেলের দলের হাতিয়ার যেমন জাল আর খাঁচা তেমনি বুনো শিকারীদের হাতে বাণ!

তারই একটা বান পাখীর গায়ে না লেগে এসে লেগেছে র‍্যাঁদার পিঠে!

র‍্যাঁদার চীৎকার শুনে সবাই সেইখানে ছুটে এলো— [চল্‌বে]

---

* আষাঢ় সংখ্যায় ভুলক্রমে ক্রমিক নং আট এর জায়গায় নয় হয়ে গিয়েছিল।

ধুলোর রাজ্যে থাকে যারা ঃ সরল কবির পক্ষে

— বিশ্বপ্রিয় —

যে মেয়েটার কথা কিছুই হয়নি লেখা ছড়ায়—
গল্পে গেঁথে তোলেনি কেউ সহজ পাটের পড়ায় ঃ
সরল মনের 'সরল কবি' তার জীবনের কথা,
তোমার লেখায় ঠাঁই পেয়ে আজ পেল অমরতা।

মিঠুর মত মেয়ের কথা অনেক কবিই লেখে—
দুখের ছায়া দেখলো না যে, কখনো দূর থেকে,
জন্মদিনের উপহারে ঘর খানি যার ভরা ঃ
সেই মেয়েরই খেলার রাজ্য স্বপ্নেতে হয় গড়া।

বুকুন যার কথা শোনায়—মাথায় যার উকুন,
তার কথা আর আমরা বল ভাবি কত টুকুন ?

সাত বছরেই পুতুল ফেলে—দুখীনি মা'র সাথে,
পরের ঘরে খাটতে যার হয় দিনে আর রাতে ঃ
যার দাদাকে হঠাৎ ছেড়ে লেখা পড়ার কাজে—
হয় বিকোতে নোন্‌তা বাদাম, চল্‌তি গাড়ীর মাঝে,
তার দুঃখের রোজ নামাচা ঃ সরল তোমার লেখায়
নতুন করে ওদের জগৎ দেখতে আমায় শেখায়।

"মিঠু-মিতুল-মুন্না" নয়—সেই মেয়েটার কথাই,
ভাববো আমি ঃ ধুলোর রাজ্যে, দিন কাটে যার সদাই॥

———

ছবির কথা

অহিভূষণ মালিক

[দশ]

গত সংখ্যায় কিউবিস্টিক ছবি বা কিউবিজম সম্বন্ধে কিছুটা বলেছি এবার তোমাদের সুররিয়ালিস্টিক ছবি সম্বন্ধে কিছু বলি। সুররিয়ালিজম কথাটি এসেছে সুপার রিয়ালিজম থেকে। সুপার হলেন তিনি যিনি সবার ওপরে। অর্থাৎ রিয়ালিজমের ওপরে সুপার রিয়ালিজম। রিয়ালিস্টিক ছবি হল, আমরা সচরাচর যা চোখে দেখি যা আশে পাশে ঘটছে তার প্রকাশ। সুররিয়ালিজম তা হলে এই চোখে দেখা রূপের ওপরে যা তাই। সেটা কি ?

সুররিয়ালিস্টপন্থীরা বলেন যা চোখে দেখা যায় তা সবই মেকী। যা মনের সাহায্যে দেখা হয় তাই আসল। যখন আমরা জেগে থাকি তখন আমাদের কতকগুলি বাঁধা সামাজিক নিয়মের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়। মন চাইলেও অসামাজিক কিছু করার উপায় নেই। যদি, ধর একটি ঘরে সুন্দরভাবে চেয়ার টেব্‌ল সাজানো আছে; এক ভদ্রলোক ঐ ঘরে ঢুকে চেয়ারে না বসে টেব্‌লের তলায় কোট-প্যান্টুলন পরা অবস্থায় পা মুড়ে বসলেন। নিয়মটা হল চেয়ারে বসার, টেব্‌লের নিচে নয়। কিন্তু ভদ্রলোকের মন থেকে ঐ ভাবে বসতেই হয়ত ইচ্ছে হয়েছিল। একেই বলে সুররিয়ালিজম। যখন আমরা জেগে থাকি তখন আমাদের কাজ, কর্ম, চিন্তা সবই হয় সামাজিক নিয়মে। সুররিয়ালিস্টপন্থীরা তাই বলেন আমাদের মন মুক্তি পায় যখন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের মধ্যে আমরা নানান রকম অস্বাভাবিক স্বপ্ন মাঝে মাঝে দেখি। এঁদের মতে সেইটেই হল আসল মন দিয়ে দেখা; কারণ, নিয়ম দিয়ে বেঁধে রেখে তখন মনকে চালনা করা হয় না। মনস্তাত্ত্বিকরা এই মনের নাম দিয়েছেন অবচেতন মন।

স্বপ্নে যেমন উদ্ভট সব ঘটনা দেখা যায় সুররিয়ালিস্ট শিল্পীদের ছবিতেও সেই

রকম অস্বাভাবিক কল্পনা চোখে পড়ে। স্যালভাডোর ডালির আঁকা লেডী মাউন্টব্যাটেনের একটি প্রতিকৃতি আছে। প্রতিকৃতিটি একেবারে নিখুঁত কিন্তু লেডী মাউন্টব্যাটেনের মাথায় কেশগুচ্ছের বদলে ডালি গাছপালা শেকড়বাকড় দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছেন। অনেক মেয়ে বা পুরুষের চুল দেখে আমাদেরও ঐ রকম মাঝে মাঝে চিন্তা হয় কিন্তু আমাদের সংযত থাকতে হয়। ডালির স্যুররিয়ালিস্ট মন আমাদের মত সংযত থাকতে নারাজ।

স্যুররিয়ালিজম আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৯২৪ সালে। ফ্রান্সের আঁদ্রে ব্রেতঁ এই আন্দোলনের পাণ্ডা ছিলেন। তিনি একজন কবি। আসলে কবিতা এবং সাহিত্যে স্যুররিয়ালিজম যত গুরুত্ব লাভ করেছিল চিত্রকলায় ততটা করেনি। ব্রেতঁর আহ্বানে স্যুররিয়ালিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী কয়েকজন শিল্পী, যেমন ডালির নাম আগেই উল্লেখ করেছি, ম্যাক্স আর্ণস্ট, পেয়র তাঁগে, জার্জিও ডি সিরিকো প্রভৃতি। এই শিল্পীদের জন্যই স্যুররিয়ালিস্ট ছবি একটি বিশেষ জাত হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। আধুনিক কবিতা এবং আধুনিক সাহিত্যে স্যুররিয়ালিজমের প্রভাব আজও খুব স্পষ্ট, কিন্তু সমকালীন চিত্রকলার স্যুররিয়ালিজম তেমন জোরদার নয়। দু চারজন শিল্পী স্যুররিয়ালিস্টক জাতের ছবি আঁকেন বটে কিন্তু তার মধ্যে স্বকীয়তা কিছু দেখা যায় না। পূর্বসুরীদের কাজের পুনরাবৃত্তিই এগুলিকে বলা চলে, কেবল সামান্য হের ফের লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে জারমানিতে কয়েকজন কবি এবং সাহিত্যিক কিছু পত্রিকা প্রকাশ করেছিলে। প্রত্রিকাগুলির নাম ছিল ডাডা। ডাডা শব্দের কিছু অর্থ নেই। এই সব কবি এবং সাহিত্যিকদের কাছে পৃথিবীতে কোনও কিছুরই যৌক্তিকতা বা অর্থ ছিল না। ডাডাইজম-এরই বংশধর স্যুররিয়ালিজম।

স্যুররিয়ালিস্ট শিল্পীরা প্রত্যেকেই অসাধারণ ভাল রিয়ালিস্টিক ছবি আঁকতে পারেন কিন্তু সাধারণ যুক্তি অনুযায়ী রিয়ালিস্টিক ছবিতে যেভাবে বিষয়বস্তু ব্যবহার করা হয়ে থাকে স্যুররিয়ালিস্টরা তা করেন না। এঁদের রচনায় বিভিন্ন বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক সব সময়েই অস্বাভাবিক।

———

গৌরাঙ্গ পর্বত ও বিধান পর্বত

নর্থ গাড়োয়াল হিমালয় অভিযান নামে দশজনের যে পর্বত অভিযান দলটি সুনীল চৌধুরীর নেতৃত্বে ২৮শে মে তারিখে কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিল সেইদল এক অভিনব কাজ করে কলকাতায় ফিরে এসেছে। তাঁরা দুটি অজেয় শৃঙ্গ জয় করে তার নতুন নামকরণ করেছেন। এই নামকরণের কাজ এর আগে ভারতবর্ষে আর কোনদল করেন নি।

প্রথম শীর্ষটির নাম দিয়েছেন তাঁদের সতীর্থ স্বর্গত এক বন্ধুর নামে—"গৌরাঙ্গ পর্বত"। বন্ধুটির নাম ছিল গৌরাঙ্গ সুন্দর চৌধুরী। তিনি পাহাড়ে উঠতে গিয়েই ১৯৬৫ সালে পাহাড়ের বুকে বরফের মধ্যে কোথায় যে রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যান আজও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। কিন্তু তিনি হারিয়ে গেলেও বন্ধু পর্বতারোহীদের মনে আজও অমর হয়ে আছেন। গৌরাঙ্গের স্মৃতিকে পবিত্র অক্ষয় করে রাখার জন্যে তাঁরা শীষটির নাম দিয়েছেন "গৌরাঙ্গ পর্বত"। গৌরাঙ্গ পর্বতে উঠেছিলেন শ্রীপ্রাণেশ চক্রবর্তী, অমিয় মুখার্জি, ও ৩জন শেরপা। গৌরাঙ্গ পর্বতের উচ্চতা ২০,৩৫৬ ফুট।

এঁদের আর একটি কীর্তি আরও গৌরবোজ্বল। এঁদেরই আর একটি দল আরও এক দুরূহ ও উঁচু পর্বতে আরোহণ করে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের নামে নাম দিলেন, "বিধান পর্বত।" বাংলা দেশের স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে পর্বতারোহণের জন্মদাতা। তাঁরই প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের প্রথম পর্বত আরোহণ করার শিক্ষালয় দার্জিলিঙে স্থাপিত হয় ১৯৫৪ সালে। তাঁর নামে একটি পর্বত শীর্ষের নামকরণ করে হিমালয়ের ঐ পূত পবিত্র পুণ্যভূমিতে যেন একটি শ্বেত শুভ্র মন্দিরের মধ্যে তাঁর অমর-আত্মার প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিধান পর্বতের উচ্চতা ২১৩৯০ ফুট। উঠেছিলেন শ্রীবিশ্বদেব বিশ্বাস, (পর্বত অভিযাত্রী সঙ্গের মানা ও কাবরুডোম অভিযানের নেতা ও আমাদের এভারেষ্ট মহাকাব্যের লেখক) জি, এস, মালিয়া ও ৩জন শেরপা।

কিন্তু প্রতিটি অভিযানে যাঁরা শীর্ষে ওঠেন তার থেকেও বড় কৃতীত্ব দলের অন্য সদস্যদের যাঁরা নিজেদের মহান ত্যাগ ও সেবার দ্বারা অন্য বন্ধুদের শীর্ষে পাঠান। এই দলে সেই মহান ত্যাগের কীর্তি রেখেছেন দলের ডাক্তার শ্রীবিমল ভূষণ ঘোষ দস্তিদার, কোয়াটার মাষ্টার শ্রীশান্তি ঘোষ যিনি সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত অবিরাম অবিশ্রাম খেটেও কোন ধন্যবাদ পাননি, শ্রীসমর ব্যানার্জি, ও সহনেতা বৈদ্যনাথ রক্ষিত। তাঁদের সকলকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

অংকের ম্যাজিক

যাদুশিল্পী সুনীল দত্ত

ম্যাজিক অনেকাংশে বুদ্ধির ব্যাপার। মানুষের বুদ্ধি যেমন বহুমুখী, ম্যাজিক তেমনি অসংখ্য রকমের হতে পারে। তবে ম্যাজিককে মোটামুটি কতকগুলো শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে। অংকের ম্যাজিক এমনি একটা শ্রেণী।

অংকের ম্যাজিকের বিশেষত্ব আছে। বলতে গেলে এটা পুরোপুরি বুদ্ধির ব্যাপার। এ ম্যাজিক কাউকে দেখালে সে এর রহস্যের মূল ধরতে গিয়ে ধাঁধার উত্তর বের করবার আনন্দ পেতে পারে। অংকের ম্যাজিকের চর্চা করতে করতে অংক বিষয়ে পারদর্শিতা বাড়বার সুযোগ আছে।

সোনার কাঠির ছোট বন্ধুদের কাছে একটা অংকের ম্যাজিক নিয়ে আলোচনা করছি।

ছয় অংক বিশিষ্ট যে কোন সংখ্যা নাও। সংখ্যার অংকগুলো উলটিয়ে সাজাও। এই নতুন সংখ্যাটি ও তোমার নির্ধারিত সংখ্যাটির অন্তর ফল নির্ণয় কর।

এবার এই অন্তর ফলের সংখ্যাটিকে আবার উলটিয়ে সাজাও। অন্তর ফলের সংখ্যাটি ও শেষোক্ত উলটানো সংখ্যাটি যোগ কর।

যোগ ফলটি কতো হলো কিছু না দেখেই বলে দেওয়া যায়।

উত্তর হলো—১০৯৮৯০০।

কি করে হলো

আসলে যে কোন ছয় অংক বিশিষ্ট সংখ্যা নিয়ে সুরু করলেই উত্তর হবে—১০৯৮৯০০।

দুটি উদাহরণ দিচ্ছি।

(ক)

৯৬৩২১৫

(−) ৫১২৩৬৯

৪৫০৮৪৬

(+) ৬৪৮০৫৪

১০৯৮৯০০

(খ)

	৮৫৪৩২০
(−)	০২৩৪৫৮
	৮৩০৮৬২
(+)	২৬৮০৩৮
	১০৯৮৯০০

পরিশেষে একটি কথা বলি। খেলাটি স্বতঃসিদ্ধ মনে হচ্ছে। কিন্তু একটি ব্যতিক্রম আছে। ছয় অংক বিশিষ্ট সংখ্যাটি ও তার উলটানো সংখ্যার যে অন্তরফল হবে সেটাও ছয় অংক বিশিষ্ট হওয়া চাই, পাঁচ অংক বিশিষ্ট হলে চলবে না।

টিঙ্কুর ভ্রমণ

বিশণ মিত্র

টিপ্ টিপ্ টিপ্ বর্ষা জলে
ছুটছে ছোট্ট নাও
হালটি বেয়ে টিঙ্কু কোথায়
যাচ্ছ বলে যাও।
কড়্ কড়্ কড়্ বাজ পড়ল
তাল তমালের গায়
ভয় পেয়ে আজ গরু বাছুর
লেজ তুলে দৌড়ায়।
নীড়ে ভেজে পাখ পাখালী
করুণ চোখে চায়
ছোট্ট তরী দুলছে ভারী
ঢেউ এরই দোলায়।

সাত সমুদ্দুর তের নদী
পেরিয়ে অবশেষে
টিঙ্কু তোমার ভিড়ল তরী
অচিন পুরে এসে।
খেলার সাথী জুটল অনেক
উঠল তোমার নায়
রূপ কথারই দেশ দেখালো
ফুট ফুটে জ্যোৎস্নায়।
মায়ের কথা পড়তে মনে
মন হল চঞ্চল
নাও ছুটিয়ে ফিরলে তুমি
ধরলে মা'র অঞ্চল।

- জুলুম হীন লীগ।
- অ্যাসেজ অস্ট্রেলিয়ারই রইল।
- উইম্বলডনের খবর।
- বংশী শীল—বেষ্ট বক্সার।

—চিরঞ্জীব

কথায় বলে সুচনাটা শুভ হওয়া দরকার। নইলে চলার পথে বা সেই কাজের মাঝে নানা বাধা এসে পড়তে বাধ্য। কথাগুলো যে কত সত্যি—কলকাতার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগ তার প্রমাণ। লীগের শুরু নিয়ে কত গোলমাল হয়েছিল তা তখন লিখেছিলাম, শুধু ইষ্টবেঙ্গলের 'গোঁ'-র জন্য লীগ খেলা প্রায় একমাস দেরীতে শুরু হয়েছিল। কারণ তাঁরা সিঙ্গল লীগ খেলতে রাজি ছিলেন না। আই, এফ, এ-র পক্ষ থেকে তখন এই মর্মে বলা হয়েছিল যে, ইষ্টবেঙ্গলের আবদার মানা হবে না। আই, এফ, এ-র অনমনীয়তাকে অনেকেই প্রশংসা করেছিলেন। কারণ কোন একটি বিশেষ দলের 'হ্যাঁ' বা 'না' অনুযায়ী সব বরবাদ হতে পারে না। কিন্তু সপ্তাহকাল না যেতেই তাঁরা মতটা পালটালেন। ইষ্টবেঙ্গলকে নানাভাবে রাজি করানোর চেষ্টা হতে থাকল। পরে ঠিক হয়েছিল প্রথমে সিঙ্গল লীগ হবে, পরে শীর্ষের চার টীমের মধ্যে সুপার লীগ অর্থাৎ আবার ওদের মধ্যে একটি করে খেলা। ইষ্টবেঙ্গল অবশেষে আসরে নামলো।

আশা করেছিলাম সব জট বুঝি খুলেছে—এখন দেখছি না; মাঝপথে এসে আবার অচলাবস্থা। খেলা বন্ধ হয়নি বটে, কিন্তু যা হাল, তা বন্ধ হওয়ারই সামিল। ইষ্টবেঙ্গল জানিয়ে দিয়েছে আপাতত তারা খেলতে পারবে না। পরিষ্কার করে কোন কারণ তারা দেখায় নি। মোহনবাগানের সঙ্গে চ্যারিটি ম্যাচটি না হওয়ার কোন উপযুক্ত যুক্তি ছিল আমাদের মনে হয় না।

ইষ্টবেঙ্গলের পক্ষ থেকে যে তারিখের কথা বলা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে মারডেকাগামী ভারতীয় ফুটবল টীমের ওই দলের খেলোয়ার স্থান পাওয়ায় (প্রতিবারই পায়) তাদের পক্ষে খেলা সম্ভব নয় অর্থাৎ লীগের উত্তেজনা মাটি হল। অবশ্য

এই অচলাবস্থার জন্য শুধু ইষ্টবেঙ্গল দায়ী নয়। প্রত্যক্ষে সিঙ্গল লীগের পক্ষে ভোট দিলেও বড় ক্লাবগুলি পরোক্ষে সিঙ্গল লীগের বিপক্ষে ছিল। মারডেকার অজুহাতও; কিন্তু অন্যদলেরও আছে। তাদের খেলোয়াড়রাও খেলতে পারতেন না। অর্থাৎ

প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগের খেলায় মোহানবাগান ক্লাবের পি গাঙ্গুলিকে গোলের সামনে বাধা দিচ্ছেন টেলিগ্রাফ দলের রক্ষণভাগের একজন খেলোয়াড়

ওদের বাদ দিয়ে কোন ক্লাবই নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সংশয়হীন নয়। দায়ী আই, এফ, এ-ও। বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ভালো খেলোয়াড়রা অবশ্যই প্রয়োজনে দলের বাইরে থাকবেন। পৃথিবীর অন্য দেশে এমন নজীর ভুরি ভুরি রয়েছে। সেখানে

আগে দেশ, তারপর দল। কিন্তু এদেশে বিপরীত ঘটনা। আগে দল, তারপর দেশ। প্রসঙ্গক্রমে এবার স্টিলের এশীয় যুব ফুটবলের জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর আভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য। সেখানে ভারতীয় খেলোয়াড়রা পা বাঁচিয়ে খেলেছিলেন ক্লাবের কথা ভেবে। কেননা, কলকাতায় ফুটবল সিজন আসছে। 'ফরম' না থাকলে টীমে চান্স পাওয়া দুষ্কর হবে যে!

আই, এফ, এ বা অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কিন্তু কোন ক্ষমতা নেই যে ক্লাব খেলোয়াড়দের যথেচ্ছাচার বন্ধ করেন!

অ্যাসেজ অস্ট্রেলিয়ারই রইল

ইংল্যাণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট সিরিজ শেষ হয় নি। খেলা দেখে অষ্ট্রেলিয়াকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মনে হলেও ইংল্যাণ্ড এ্যাসেজ ছিনিয়ে নিতে পারলো না। টেষ্ট সুরুর আগে ভবিষদ্বাণী করা হয়েছিল কলিন কাউড্রের দল—ইংল্যাণ্ডই জিতবে। কারণ তার তের সপ্তাহ আগে ওরা বিশ্ববিজয়ী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকেও কোনঠাসা করে দেশে ফিরেছিলেন। সুতরাং ইংল্যাণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া সিরিজ সম্পর্কে ওই ভবিষ্যদ্বাণী অহেতুক ছিল না। কিন্তু প্রথম টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ডকে নিদারুণভাবে পরাস্ত করে। দ্বিতীয় টেষ্টে জয় ইংল্যাণ্ডের হাতের মুঠোয় এসেছিল, কিন্তু বৃষ্টি সব আশায় বাদ সাধে। আশা করেছিলাম দ্বিতীয় টেষ্টের ষ্ট্যাণ্ডার্ড বজায় থাকলে তৃতীয় টেষ্টে ইংল্যাণ্ড জিতবেই। কিন্তু আবহাওয়া আবার প্রতিকূল। সব ড্র হয়ে গেল। চতুর্থ টেষ্টেও তাই। অষ্ট্রেলিয়ার ভাগ্য এইভাবে সুপ্রসন্ন হওয়ায় অ্যাসেজ ওরা পেলেন। পঞ্চম ও শেষ টেষ্টে যদি ইংল্যাণ্ড জেতে তবুও অষ্ট্রেলিয়ার কাছেই অ্যাসেজ থাকবে। তবুও বলব ইংল্যাণ্ড পরাজিত হলেও ওদের কট্টর বিরোধীরাও এবার কলঙ্ক লেপন করতে পারবেন না। কলিন কাউড্রে বা তাঁর সতীর্থদেরও কোন দোষ দেওয়া অহেতুক হবে। কারণ প্রথম টেষ্টেই শুধু ইংল্যাণ্ডের বিপর্যয় হয়েছিল। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ টেষ্টে তারা প্রমাণ করেছেন—ক্রিকেটে ইংল্যাণ্ড কৌলিন্য হারায়নি ব্যাটিং বোলিং, ফিল্ডিং কোনটিতেই অষ্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ডের সমকক্ষ নয়। কাউড্রের নেতৃত্বেও দুর্বলতার পরিচয় মেলেনি।

তবুও

তথাপিও ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট কণ্টোল বোর্ডের সভায় কাউড্রের সমালোচনা

অদ্বিতীয়

করা হয়েছে। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা শারীরিক কারণে তাঁকে বাদ দেওয়া হলেও তিনি অতটা অসুস্থ ছিলেন না। নেতৃত্ব বদলের জন্যই ক্রিকেট কণ্টো্ল বোর্ড ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

মেক্সিকো অলিম্পিকের জন্য অ্যাথলেটিকসের একমাত্র যোগ্যতম প্রতিনিধি নির্বচিত হয়েছেন হ্যামার থে্ায়ার প্রাভীন কুমার। একুশ বছর বয়স্ক প্রাভীনকুমার হ্যামারের স্বর্ণ পদকটির জন্য এখন দিন-রাত পরিশ্রম করছেন। পারভীনের লক্ষ্য ঃ "মেক্সিকোয় যাওয়ার আগেই আমি হ্যামারটি ৭০ মিটার ছুঁড়তে পাববো।"

উইম্বলডনের খবর

মহিলাদের সিঙ্গলস বিজয়িনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিলি জিনকিং হারিয়ে দেন তাঁরই দেশের পি, বার্থকুইজ্, স্টেফেনি ডি ফিনা, আষ্ট্রেলিয়ার এম, মুর, যুক্তরাজ্যের এ, জোন্স ও অষ্ট্রেলিয়ার জুডি টেগার্টকে।

পুরুষদের সিঙ্গালস বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়ার রড লিভারের কাছে হারেন যুক্তরাষ্ট্রের জি, স্কট, এস. স্মিথ, এম. রিসেন, ডি. র‍্যালস্টন, আর্থার অ্যাশ, যুক্তরাজ্যের এম. কক্স ও অষ্ট্রেলিয়ার এ, জে, রোচে।

বংশী শীল—বেষ্ট বক্সার

কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজিয়েট স্কুলের (বিজ্ঞান) ছাত্র, বংশী শীল সম্প্রতির কটকে অনুষ্ঠিত জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যামপিয়নশীপসে 'বেষ্ট বক্সারে'র পুরস্কার পেয়েছে। বাংলা স্কুলের ছাত্ররা ৩৭ পয়েন্ট পেয়ে টীম চ্যামপিয়নও হয়েছে। বংশী গতবছর কলকাতায় আর্মেনিয়ান কলেজে স্কুল ও জুনিয়র বক্সিং-এর জাতীয় প্রতিযোগিতায় 'বেস্ট বক্সার' হয়েছিল।

১৯৬৪-তে সে ভারতীয় স্কুলের হয়ে নেপালে প্রদর্শনী বক্সিং লড়ে এসেছে।

বংশীর বক্সিং-এ হাতেখড়ি বাবা জে, কে, শীলের কাছে—সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের এস, ও, পি, সি,-তে।

———

পরিবারের সবাই খুশী

দেশী গাছ গাছড়া থেকে আয়ুর্বেদ মতে তৈরী সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ ও সর্বপ্রকার দন্তরোগ দূর হয়, দাঁতের 'এনামেল' হয় শক্তিসম্পন্ন, দাঁত হয় সুস্থ, সবল ও ঝক্‌ঝকে। মুখে ফুটে ওঠে সুন্দর হাসি। তাই আমরা এক আশ্চর্য দাঁতের মাজন

সাধনা দশন

ব্যবহার করি।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি, এস,(আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য।